মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৬ষ্ঠ বর্ষ • ১ম সংখ্যা • রমাযান-১৪৩৮ • জুন-২০১৭



بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক
সরল পথ

রেজিঃ নংঃ WBBEN/2012/45211

৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা
রমাযান-শওয়াল ঃ ১৪৩৮ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ঃ ১৪২৪ বাংলা
জুন ঃ ২০১৭ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

★★ প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়।

সূচীপত্র — পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

সিয়ামের শিক্ষা

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি হল রমাযানের সিয়াম। আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের উপর পূর্ববর্তী জাতির মতই রমাযানের সিয়াম পালন অপরিহার্য করেছেন এবং সিয়ামের আসল উদ্দেশ্যই হল তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম অপরিহার্য করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া হাসিল করতে পার'' (সূরা বাক্বারাহ্ আয়াত নং ১৮৩)। তাকওয়া হল একটি আবস্ট্র্যাক্ট নাউন। যা দেখা যায় না বা ছোঁয়া যায় না বরং অনুভব করতে হয় যেমন ভালোবাসা, ঘৃণা, দয়া ইত্যাদি। তাকওয়া হল সেই অনুভূতির নাম যা মানুষকে ভালো কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করে আর মন্দ কাজে বাধা দেয়। একজন সিয়াম পালনকারীকে অবশ্যই সেই তাকওয়া অর্জন করতেই হবে; তবেই তার সিয়াম সার্থক হবে। তাকওয়া হল সম্পূর্ণ হৃদয়ের বিষয়। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের হৃদয়ের দিকে ইশারা করে তিনবার বলেন, ''তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে'' (সহীহ্ তারগীব অ তারহীব ২২৩২)। ''কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সৌন্দর্য ও ধন সম্পদ দেখবেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখবেন'' (মুসলিম ৪৬৫১)। ''প্রতিটি মানব দেহে একটি মাংস পিণ্ড রয়েছে। যা ভালো থাকলে সমস্ত শরীর ভালো থাকবে আর যা বিগড়ে গেলে সমস্ত শরীর বিগড়ে যাবে। আর সেটি হল হৃদয়'' (বুখারী ৫০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''তোমরা আখেরাতের জন্য পুঁজি সংগ্রহ কর, নিশ্চয়ই তাকওয়াই হল শ্রেষ্ঠ পুঁজি'' (২/১৯৭)। সুতরাং তাকওয়াই হচ্ছে একজন মুমিনের আমল ও ঈমানের চাবিকাঠি। যার যত বেশি তাকওয়া রয়েছে সে তত বেশি ঈমানদার ও ভালো মানুষ। তাকওয়া অর্জন কারী ব্যক্তিদেরকেই মুত্তাকী বলা হয়। আল্লাহ্ বলেন, ''নিশ্চয় তোমাদের মাঝে বেশি তাকওয়া অর্জনকারীরাই বেশি সম্মানিত'' (৪৯/১৩)। আল্লাহ্ ভীতি অর্জিত হওয়ার ফলে সিয়ামপালনকারী পরিস্কার ও নির্মল হৃদয়ের আল্লাহ্ভীরু মানুষে রূপান্তরিত হয়। এমন আল্লাহ্ভীরু মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সিয়াম শব্দের অর্থ হল বিরত থাকা। একজন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি কেবল পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকেই বিরত থাকবে এমন নয় বরং সে সকল প্রকার পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। সে মানুষকে মন্দ ও কর্কশ ভাষায় কথা বলবে না, অকারণে চেঁচামেচি করবে না, তর্ক-বিতর্ক-ঝগড়া-ফাসাদ থেকে বিরত থাকবে। সে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। সে মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ করবে। এভাবে সিয়াম পালনকারী একজন চরিত্রবান ও সৎ মানুষে রূপান্তরিত হবে।

সিয়াম পালনকারী অপ্রয়োজনীয় বেশি বেশি পানাহার বর্জন করে। ফলে তার বহু রোগের আরোগ্য হয়, শরীরের মেদ ঝরে যায়। তার শরীর সুস্থ সবল ও মজবুত হয়।

সিয়াম পালনকারী নিয়মানুবর্তী ও সময়ানুবর্তী হয়ে ওঠে। রমাযানের সিয়াম পালন করতে কতকগুলি নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। এ সময়ে সিয়াম পালনকারী ঠিক সময়ে সাহারী, ইফতার ও স্বলাত সম্পাদন করার জন্য নিজের প্রাত্যহিক কাজের রুটিন করে নেয়। ফলে তার প্রাত্যহিক কাজও ঠিকঠাক সম্পন্ন হয় আবার ইবাদাত বন্দেগীও সময় মত হয়। এভাবে সিয়াম পালনকারী রুটিনমাফিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পরবর্তী ১১ মাসের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়।

সিয়ামের অর্থ যেহেতু বিরত থাকা। তাই একজন সিয়াম পালনকারী অন্যায় বা অপকর্মকারীর প্রতিশোধ গ্রহণেও বিরত থাকার চেষ্টা করে এবং ক্ষমা করতে শেখে। সে অপরাধীকে ক্ষমা করে প্রশান্তি লাভ করে। অপরাধীও মার্জনা লাভ করে লজ্জিত হয় এবং নিজের সংশোধন করার সুযোগ লাভ করে এবং একসময় সেও একজন সৎ ও ভালো মানুষে পরিণত হয়।

সিয়াম পালনকারীর হৃদয়ে দুর্বল-দুঃস্থ ও দুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হয়। রমাযান মাসে এ কারণে সিয়াম পালনকারী অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি বেশি দান খয়রাত করে। সমাজের অসহায় ও দরিদ্র মানুষের প্রতি সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ফলে অসহায় মানুষেরাও খুশি হয়। একমাস যাবৎ দান খয়রাত করতে করতে অসহায় মানুষকে সাহায্য করার অভ্যাস তার তৈরি হয়। সে ধীরে ধীরে দাতা ও দানশীল মানুষ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

সিয়াম পালনকারী রমাযানের শেষ দশকে বিজোড় রাতগুলিতে জেগে জেগে আল্লাহ্কে ডাকে এবং এক হাজার মাসের নেকী বা পূণ্য অর্জনের সুযোগ লাভ করে। এ রাতগুলিতে জেগে আল্লাহ্র ইবাদাতে মাশগুল হয়ে মানুষ নিজেদের পাপকর্মগুলিকে স্মরণ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহ্র সামনে নির্জনে অকপটে সব কথা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দেন। ফলে সিয়াম পালনকারীর আত্মা ও প্রশান্তি লাভ করে।

এভাবে যখন একজন সিয়াম পালনকারী তাকওয়া বা আল্লাহ্ ভীরুতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, তখন সে সমস্ত কাজে আল্লাহ্র নির্দেশিকা ও বিধান জানার চেষ্টা করবে এবং সেই মুতাবিক কাজ করবে। অজান্তে কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হলেও, নিজের কৃত পাপ কর্মের জন্য আদি পিতা আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর মত ভীষণভাবে অনুতপ্ত হবে এবং আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এমন লোকেরাই তো প্রকৃত আদম সন্তান।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে প্রতি বছর রমাযান মাস আমাদের জন্য ভালো মানুষ হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসে কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারি না। যদি কোনো মানুষ প্রতিবছর রমাযান মাসে একটি করে অপকর্ম পরিহার করে আর একটি করে সৎকর্ম গ্রহণ করে, তাহলে সে একজন প্রকৃত ঈমানদার মানুষে পরিণত হবে ইনশা-আল্লাহ্।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে সিয়ামের তাৎপর্য বোঝার তাওফীক দান কর — আমীন।

১

১

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

মুসলিম তুমি নিজেকে চেনো

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

(যেভাবে আমি কা'বাকে বিশ্বের ঠিক মধ্যস্থানে স্থাপন করেছি যাতে সমগ্র পৃথিবীর সত্যান্বেষী মানুষ তাকে সম্মুখে রেখে ইবাদাত করতে পারে) অনুরূপ তোমাদেরকে আমি মধ্যপন্থী জাতি হিসাবে নির্ধারণ করেছি, যাতে তোমরা লোকেদের উপর সাক্ষ্যদাতা হও এবং রসূল (মুহাম্মাদ) তোমাদের উপর সাক্ষী হন। আপনি যে ক্বিবলার উপর এ যাবৎ ছিলেন তাকে এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম যাতে আমি প্রত্যক্ষভাবে অবগত হই যে, কারা রসূলের অনুসরণ করছে আর কারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যদিও তা (কা'বা হতে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করাটা) মুসলিমদের জন্য কঠিন কাজ। কিন্তু তাদের জন্য নয় যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ লোকেদের প্রতি অতীব দয়াবান ও করুণাময় (সূরা বাক্বারাহ্ ১৪৩)।

অধুনা বিশ্ব জরীপ দ্বারা সুপ্রমাণিত যে, কা'বাতুল্লাহিল হারাম পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। বেদেও কা'বার অবস্থান স্থল সম্পর্কে অনুরূপ ইঙ্গিত এসেছে। ইসলাম যে সার্বজনীন দ্বীন ও গোটা বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হতে অনন্য জীবন বিধান তার প্রমাণ সমূহের মধ্যে কাবার অবস্থান অন্যতম। সঙ্গত কারণেই কা'বার প্রতি বিশ্ব মুসলিমের প্রাণের আকর্ষণ থাকাটা যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু ঈমান পরীক্ষার জন্য এবং কারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নিঃশর্ত আনুগত্য করছে ও কারা করছে না তা মুসলিমদের সামনে ফুটিয়ে তোলার জন্য ইচ্ছা বিরুদ্ধ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন ও পরে তা প্রত্যাহার করেছেন। কিছু দিনের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল বায়তুল মাকদিস অভিমুখে স্বলাত আদায় করার জন্য। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সহ সকল মুসলিমের হৃদয় ব্যাকুলতার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতঃ মহান আল্লাহ্ তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করেন ও কা'বা অভিমুখে স্বলাহ্ আদায় করার আদেশ বহাল রাখেন। সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করতঃ আল্লাহ্ বলেন, যেমন কা'বাকে বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছি — অনুরূপ তোমাদেরকেও সমস্ত জাতির জন্য কেন্দ্র ও সেন্ট্রাল পজিশনে রেখেছি। তোমাদের নীতিতে না আছে অতিরঞ্জন, আর না আছে প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে স্বল্পতা। বাংলা ভাষায় যাকে বলে মধ্যমপন্থা, আরাবীতে সেটাকেই অসাত্ব বলে। যে জাতিকে কেন্দ্র করে বিশ্ব জনসমাজকে আবর্তিত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে মধ্যমপন্থী দল রূপে চিহ্নিত করেছেন, তার দায়িত্ব কত বিশাল, কত মহান ও কত স্পর্শকাতর। তাকে কতটা হিসাব নিকাশ করে ও মেপে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهٗ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

অর্থ ঃ ওই জাতের শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই ভাল কর্ম সমূহের আদেশ প্রদান করবে ও মন্দ কর্ম সমূহ হতে নিষেধ করবে, নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ হতে শাস্তি পাঠাবেন তোমাদের উপর, অতঃপর তোমরা দুআ করলেও তা গৃহীত হবে না (তিরমিযী ২১৬৯, হাদীস হাসান)।

অন্যকে ভাল কাজের আদেশ দেওয়া তো দূরাস্ত। স্বয়ং মুসলিম উম্মাহ্র বেশির ভাগ লোক সামাজিক অপকর্মের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাদের আদর্শের দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত হওয়ার চাইতে তারাই অন্যের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছে। কবি ইকবালের ভাষায় —

وضع میں تم ہو نصاری تمدن میں ہنود
یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھکر شرمائے یہود

চাল চলনে তুমি খৃষ্টান, সামাজিকতায় তুমি হিন্দু, অভিশপ্ত য়্যাহুদী,

করে লাজ দেখে লুকাইতে হ্রদে সিন্ধু।

নজরুল বলেন —

ইসলামে তুমি দিয়ে কবর, মুসলিম বলে কর ফখর
মুনাফিক তুমি সেরা বেদ্বীন,
ইসলামে যারা করে যবেহ, হও তুমি তাদেরই তাবে
জুতো বওয়া তুমি, তারই অধীন।

আমাদের রুচি, বেশভূষা চাল-চালন দেখে ও বিরক্ত হয়ে ইসলামকে বদনাম করার সুযোগকে হাতছাড় করতে রাজি নয় ইসলামদ্রোহী গ্রুপ। কেননা ইসলামের আধিপত্য বিস্তারিত হলে অন্যায়ভাবে সমাজ শোষণের রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যাবে, এই শংকাতেই তাদের এই দ্বিচারিতা। বহু আশ্রম-মঠ-গীর্জা প্রধানদের অবৈধ সম্পদের পাহাড় ও তাদের অজস্র যৌন কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হওয়ার পরেও তাকে ইসলামের জাত শত্রু মিডিয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবেই তুলে ধরে। কিন্তু কোনো দাবীদার মুসলিম দ্বারা কোনো কিছু ঘটলেই তারা ইসলামকে দায়ী করে ও কাদা ছোড়াছুড়ি শুরি করে দেয়।

এক আরাবী কবি বলেন

وَ اِنْ رَّأَوْا هَفْوَةً طَارُوْا بِهَا فَرَحًا
مِنِّى، وَ مَا عَلِمُوْا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوْا.

তারা যখন আমার কোনো ত্রুটি দেখে তখন তারা আহলাদে আটখানা হয়ে তা প্রচার করতে থাকে, কিন্তু যখন তারা অমার কোনো ভাল গুণ সম্পর্কে অবহিত হয় তখন তারা সেটাকে দাফন করে ফেলে।

গত ২০.১১.১৪ বিধানসভায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার প্রাক্কালে যে কথাগুলি ফুটে ওঠে তা অত্যন্ত ভয়ংকর। পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘সীমান্তবর্তী এলাকায় দুর্গাবাহিনীর কুচকাওয়াজের আড়ালে রয়েছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির (কলম ২১শে নভেম্বর সংক্ষিপ্ত)।’’ আমরা যে সমস্ত প্রতিবেশী হিন্দুদের ঘর বাড়িতে যাতায়াত সহ তাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত করেছি, তাঁদের আচরণ বর্তমানে শত্রুসুলভ। তাঁদের কথাবার্তার ঝাঁশ ভিন্ন ধরনের। এর দ্বারা অন্য কিছু না হলেও দেশের অখণ্ডতা যে হুমকীর সম্মুখীন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইংরেজদের হতে দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে বর্ণ হিন্দুদের অসহিষ্ণুতার জন্যই দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে—নিরপেক্ষ ইতিহাস এমন কথাই বলে।

বর্তমান ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত কথাগুলো আলোচনাতে এলেও মূল কথা ছিল মুসলিমদের আদর্শবাদী হওয়া নিয়ে। আমরা যদি আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র অনুসারী কথায় ও কাজে হতাম, যদি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীবৃন্দকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে আজকে বদনাম করার কারও সাহস হত না। আজকে স্মাগ্লার মুসলিম, কালোবাজারীর নায়ক মুসলিম, মাদক দ্রব্য সেবনে এগিয়ে মুসলিম, খুনোখুনিতে মুসলিম এবং নগ্নতা ও ব্যভিচারে এগিয়ে মুসলিম। বাংলাদেশ দেশ হিসাবে মুসলিম। যেখানে অশ্লীলতায়, বেলেল্লাপনায়, ইসলাম বিরোধিতায়, আল্ কুরআন অবমাননায় এবং ইসলামী কালচারের নিন্দায় নামে মুসলিমগণ আগের সারিতে। তাহলে ইসলাম তথা মুসলিমদেরকে কলংকিত করার পথ তৈরি করছে কে? এরপর যখন অমুসলিম বিশ্বের দুষ্ট চক্র শুরু করছে তাদের খেলা, তখন আমরা শহরের রাজপথে, ফুটপথে, হাটে বাজারে, সভা সমিতিতে ডাংকা বাজাতে আরম্ভ করছি এই মর্মে যে, ইসলাম এই নয়, ওই নয়, আমরা করি নি, আমরা আদর্শবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃক্ষ তোমার নাম কী? বলে ফলে পরিচয়। ইসলামী চেহেরা, ইসলামী পোষাক, ইসলামী আহার, ইসলামী বাসস্থান, ইসলামী পাঠশাল, ইসলামী গবেষণাগার, যা দেখে বিরোধীরাও ভাবতে বাধ্য হত যে এটাই ইসলাম। কিন্তু আমরা বর্তমানে খিঁচুড়ী মুসলিম হয়ে গেছি, যার কারণে আসল পরিচিতি আজ বিপন্ন।

আল্ কুরআন সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য আমাদেরকে আইডিয়াল বা নমুনা হিসাবে ঘোষণা করেছে। আর আমরাই তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছি। এতদসত্বেও আশার আলো একটাই যে, অরিজিনাল ইসলাম আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র মধ্যে সুরক্ষিত থাকায় মাঝে মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তি ইসলামের সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে চলেছেন। সম্প্রতি মায়ানমারের বিরোধী নেত্রী আন সুং সূচী ও আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কন্যার ইসলাম গ্রহণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ্ যেখানে বিশ্বাপরাধীদের শাস্তি প্রদানের জন্য উম্মাতে মুহাম্মাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, সেখানে উম্মাতে মুহাম্মাদীর গাদ্দার সদস্যদের সাজা দেওয়ার জন্য নাবী মুহাম্মাদের (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাক্ষ্য নেবেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا.

কী হবে সেদিন যেদিন প্রত্যেক উম্মাতের বিরুদ্ধে একজন করে সাক্ষী (তাদের নাবীকে) আনা হবে, আর এদের বিরুদ্ধে (তোমার উম্মাতের বিরুদ্ধে) তোমাকে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করা হবে” (সূরা নিসা ৪১)।

হাদীসের পাঠ

হাদীসের আলোকে মাইকে ঈদের ঘোষণা

আতাউর রহমান সালাফী

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَلْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَ لَا اِقَامَةٍ.

জাবির বিন সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘‘আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে একবার দুবার নয় বহুবার দুই ঈদের স্বলাত আদায় করেছি আযান ও ইকামাত ছাড়া’’ *(মুসলিম, দুই ঈদের স্বলাত পর্ব, হাদীস নং ৮৮৭-৯)*।

বুখারীতে এ সংক্রান্ত বর্ণনা — ইবনু আব্বাস এবং জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে — ‘‘ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন আযান দেওয়া হত না’’ *(বুখারী হাঃ নং ৯৬০, অধ্যায় ঃ পায়ে হেঁটে ও বাহনে চড়ে ঈদে গমন এবং আযান ও ইকামাত ছাড়া খুতবার পূর্বে স্বলাত)*।

ঈমানদারদের গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলির মধ্যে দুই ঈদের স্বলাত হল অন্যতম। এ দুই ঈদের বিধান কার্যকরী হয় দ্বিতীয় হিজরীতে *(মিরআতুল মাফাতীহ)*। এ আমল নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় ন'বার পালন করার সুযোগ লাভ করেন। এ আমলের সকল দিক তাঁর হতে বহু হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর পাঁচটি স্বলাতের মতোই এ আমল স্বলাত হলেও অন্য স্বলাত থেকে এর নিয়ম নীতিতে বেশ পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলির মধ্যে দুটি বিষয় এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিষয় দুটি হল — এ স্বলাতে (ক) আযান নেই, (খ) ইকামাত নেই। অর্থাৎ এ স্বলাত জামাআতবদ্ধ ভাবেই আদায় করতে হবে তবুও এক্ষেত্রে আযান ও ইকামাত দুটোই অবৈধ। আরো কিছু পার্থক্য হল — জুমুআর স্বলাতের মতো রাকাআত সংখ্যা ও খুতবা থাকলেও এর খুতবা স্বলাতের পরে *(বুখারী ৯৬৩, মুসলিম ৮৮৮)*। খুতবা থাকলেও মিমবার ব্যবহৃত হবে না। ব্যতিক্রমী এ স্বলাতে কিরাআতের পূর্বে প্রথম রাকাআতে সাতবার ও দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচবার তাকবীর পড়তে হয় *(আবূ দাউদ ১১৫১, হাদীস হাসান)*। এ স্বলাতের আগে পরে কোনো সুন্নাত নেই *(বুখারী হাঃ নং ৯৬৪)*। প্রতিক্ষেত্রে যুক্তি ও বিবেক দ্বারা এর উলটো করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। এ বিষয়গুলির মধ্যে নির্বাচিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত ‘আযান নেই’ বিষয়ে দু-চারটি কথা আলোচনা করার মনস্থ করেছি।

ইকামাত বিষয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন এ জন্যই মনে করছি না যে, এ বিষয়ে আপত্তির মতো তেমন কোনো পদ্ধতি আমার দৃষ্টিতে নেই। যদি ইকামাত বা ইকামাতের বদলে কোথাও কোনো কিছু চালু থাকে তবে তা বর্জন করা একান্তই উচিৎ। ‘স্বলাত শুরু হচ্ছে, জামাআত শুরু হচ্ছে, দাঁড়িয়ে যান’ — এসব নানা বলে রসূল নীতি অনুসরণে যা বলা উচিৎ তা হল — লাইন সোজা করে নিন, লাইন সোজা করা স্বলাত প্রতিষ্ঠার প্রতীক *(বুখারী ৭২৩)*; কাতার ঠিক করে নিন, অন্যথায় আল্লাহ্ আপনাদের অন্তরে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন *(আবূ দাউদ ৬৬২, সূত্র সহীহ্)*। সোজা হয়ে দাঁড়ান, সোজা হয়ে দাঁড়ান, সোজা হয়ে দাঁড়ান *(নাসায়ী ৮১৩, সূত্র সহীহ্)*।

ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা আমলদ্বয় আল্লাহ্ তাআলা হাযির করেন মুমিনের দরবারে। কিন্তু বছরের মাত্র একবার করে উৎসব আকারে উঁকি মারার কারণে এতে শামিল হওয়ার আগ্রহ উপচে পড়ে নামেমাত্র মুসলিমদেরও। পাঁচ অক্তের স্বলাত তো দূরের কথা জুমুআয় হাজির হয় না এমন নামে মুসলিমরাই আড়ম্বরে এক নম্বরে। আমরা ঈদদ্বয়ের জন্য আযান দিই না ঠিকই, কিন্তু জুমুআয় হাজির হয় না এ রকম লোকদেরকেও সাথে নেওয়ার জন্য চালু করেছি আযানের বিকল্প রূপ মাইকের মাধ্যমে ঘোষণা। এ হাদীসটির প্রতি দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট হয়ে যাবে এ ঘোষণার বাস্তবতা। আমার জানা মতে, স্থান বিশেষে এ ঘোষণা পৌঁছে দেওয়া হয় চলমান মাইকের মাধ্যমে রাস্তায় রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায়। ঘোষণায় বলা হয় — আগামীকাল ঈদুল ফিত্‌র বা ঈদুল আযহা, অমুক সমাজের জামাআত অনুষ্ঠিত হবে অমুক সময়। আবার কোথাও ঈদের সকালে মসজিদের মাইক হতে ঘোষণা দেওয়া হয় ‘‘আজ পবিত্র ঈদুল ফিত্‌র বা ঈদুল আযহা, ঈদের স্বলাত অনুষ্ঠিত হবে অমুক সময়।’’ জানিনা আরও কোথাও অন্য কোনো ভাবে অন্য কোনো শব্দাবলি দ্বারা ঘোষণা হয় কি না ? যদি ঈদের জামাআতের সময় সূচক ঘোষণা বাঁধা ধরা কোনো নিয়মে করতে হয় তবে তার জন্য প্রয়োজন প্রমাণ। এর কোনো প্রমাণ নেই বলে যদি কোনো পদ্ধতি বা শব্দাবলী গ্রহণ করতেই হয় তবে মসজিদে মসজিদে কিংবা ঈদের মাঠে আযান পদ্ধতিতে আযানের শব্দাবলি ছাড়া অন্য কিছু অধিক সঠিক হতে পারে না। অথবা আযানের শব্দাবলি ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করলে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের স্বলাতের আহ্বানসূচক ধ্বনী ‘‘আস্‌স্বলাতু জামিআতুন’’ দ্বিতীয় স্থানের মর্যাদা রাখে। কিন্তু এসবকে এজন্যই প্রত্যাখ্যান করতে হয় যে, নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বা সাহাবীদের থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই। নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আদর্শ

থেকে পাওয়া এ স্বলাত এমন স্বলাত যাতে আযান নেই, নেই আহ্বান; ডাক নেই, নেই ইকামাতও। এ হাদীসের বিশ্লেষণে

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمَ الْاَضْحٰى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِيْنٍ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرَنِى قَالَ اَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ : اَنَّ لَا اَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَ لَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَ لَا اِقَامَةَ وَ لَا نِدَاءَ وَ لَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَ لَا اِقَامَةَ.

সমার্থবোধক নীচের হাদীসটি লক্ষ্য করলে আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ইবনু জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস ও জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ্ আনসারী থেকে আতা আমাকে সংবাদ দেন যে, তাঁরা দুজনে বলেন, ''ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহার দিন আযান দেওয়া হত না। (ইবনু জুরাইজের নীচের বর্ণনাকারী আব্দুর রায্‌যাক বলেন) আমি তাঁকে (ইবনু জুরাইজকে) এ বিষয়ে পরে আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ্ সংবাদ দেন যে, ঈদুল ফিত্‌রে স্বলাতের জন্য ইমাম বের হওয়ার সময় বা বের হওয়ার পর কোনো আযান নেই, ইকামাত নেই, কোনো ডাক নেই এবং এ ধরণের কোনো কিছুই নেই। কোনো ডাক নেই, কোনো ইকামাতও নেই *(মুসলিম হাঃ নং ৮৮৬)*।

এখানে লক্ষণীয় হল এই যে, কোনো আযান ও ইকামাত নেই শুধু বলা হয়নি, বরং কোনো ডাক নেই দু দু বার বলা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে — এ ধরণের কোনো কিছুই নেই। এরপর কোন্ দলীলের ভিত্তিতে এ ঘোষণা শরীআত সম্মত হবে, আমাদের বোধের ঊর্ধে। কাজেই এ ধরণের ঘোষণাকে রসূল নীতির বিরোধী ও সিলমোহর শরীআতে, শরীআত বর্জিত বস্তুর অনুপ্রবেশ বলেই মনে করি।

মাইকে ঈদের ঘোষণা নিরর্থক ঃ আমাদের সমাজে মাইকে ঈদের যে ঘোষণা দেওয়া হয় তার দুটি দিক (১) আগামীকাল বা আজ ঈদ— এ ঘোষণা, (২) ঈদের স্বলাত কখন অনুষ্ঠিত হবে তার ঘোষণা। এ দুই ঈদের দিন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট ও চাঁদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। চান্দ্র মাসের ২৯ তারিখের পর হিসাব অনুযায়ী নতুন চাঁদ হলেও বাহ্যত দৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত হিসাবের চাঁদ গ্রহণ করা হয় না। ঈদুল আযহা মাসের দশ তারিখে হওয়ায় এর ঈদের দিন স্থির করণে কোনো সমস্যা নেই। ঈদুল ফিত্‌র মাসের প্রথম তারিখে হওয়ার বহু সময় এতে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটু সমস্যা হলেও এ আমল পালনে, মানুষ এত আগ্রহী যে, ২৯শে রমাযানের পরের দিন ঈদ ধরে নিয়েই সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে। ২৯শে রমাযানের পরের দিন ঈদ হলে কোন্ গতিতে যে সংবাদ সর্বত্র পৌঁছে যায় তার উদাহরণ পেশ করতে আমরা সকলেই অক্ষম। যদি ২৯শে রমাযানের পরের দিন ঈদ না হয় তবে প্রয়োজন পড়ে আগামীকাল ঈদ হচ্ছে না ঘোষণা দেওয়ার। কিন্তু মাশাআল্লাহ্ বিনা মাইকের ঘোষণায় এ সংবাদও পৌঁছে যায় সর্বত্র। বাকী থাকল ৩০শে রমাযানের পরের দিনে ঈদ হওয়ার বিষয়, এক্ষেত্রে কি প্রয়োজন আছে ''আগামীকাল ঈদ'' ঘোষণার?

ঘোষণার দ্বিতীয় বিষয় স্বলাত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়। এক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আদর্শ সময়ই কেয়ামাত পর্যন্ত সমাদৃত হওয়া উচিৎ, আর তা হল সূর্যোদয়ের পর নিষিদ্ধ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেই শুরু। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ রকম প্রথম সময়েই ঈদের স্বলাত আদায় করতেন *(আবূ দাউদ ১১৩৫, ইবনু মাজাহ্ ১৩১৭, সহীহ্)*।

কোনো ঈদ এক বছর যে তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, পরের বছর ঠিক তার দশ দিন পূর্বে হয়। এ বাঁধা ধরা নিয়ম অপরিবর্তিত। পর পর দু বছরের একই ঈদে সূর্যোদয়ের পার্থক্য হবে ৫-৭ মিনিট বা কোনো কোনো সিজনে আরো কম। এই সামান্য পার্থক্যের সময়কে মিনিট সেকেণ্ড মেনে স্থির করলেও কি প্রতিবছর স্থিরকরণের প্রয়োজন পড়বে? প্রয়োজন পড়বে মসজিদের মাইকে ঘোষণার বা গলিতে গলিতে পৌঁছে দেওয়ার? ঘড়ি ঘণ্টা ধরে আমরা চলতে অভ্যস্ত। ঘড়ি ঘণ্টা ধরে সময় স্থির একবার করে একটানা চালিয়ে যাওয়া যাবে যতদিন পরিবর্তনের প্রয়োজন না পড়ে। আমরা যে সময়ে ঈদের স্বলাত আদায় করতে অভ্যস্ত তাতে লাইফটাইম স্থির করা যাবে। প্রতিবছর সময় স্থিরকরণ অপ্রয়োজনীয় ভাবনা এবং মাইকে করে তার ঘোষণা শরীআতের দৃষ্টিতে যাই হোক না কেন এমনিতেই নিরর্থক।

ঈদের সময়ের ঘোষণা কীভাবে ঃ শারীআতের আর পাঁচটি বিষয়ের মতো ঈদের স্বলাতের বিধান ও তার জামাআতের সময় সংক্রান্ত নসীহাত ইমাম সাহেব ঈদের দিনের পূর্বেই জুমুআর খুত্‌বায় কিংবা উপদেশমূলক আলোচনায় অবশ্যই করবেন। মিনিট

সেকেণ্ড ধরে চলতে অভ্যস্ত সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থিরকৃত সময় এ উপদেশের মাধ্যমেই ইমাম সাহেব ঘোষণা দিতে পারেন। এ রকম উপদেশের সাথে ঈদের স্বলাতের স্থিরকৃত সময় ঘোষিত হওয়াতে যেমন পাওয়া যাবে প্রতিদান, তেমনি পালিত হবে রসূল নীতি, অর্জিত হবে স্থিরকৃত সময়ের অবগতিও।

মাইকে ঈদের ঘোষণার ক্ষতির দিক ঃ মাইকে ঈদের ঘোষণা যেমন নিরর্থক, তেমনি এতে কিছু ক্ষতির দিকও রয়েছে। ক্ষতির দিকগুলি হল — **(১) অপচয় ঃ** যার প্রয়োজন নেই এ রকম কাজ করার ফলে সময় ও অর্থ উভয়ই অপচয় হয়। অপ্রয়োজনীয় কাজ হতে বেঁচে থাকা হল একজন মুসলিমের ইসলাম তাড়িত গুণ *(ইবনু মাজাহ্ ৩৯৭৬, তিরমিযী ২৩১৭, সূত্র হাসান)*।

(২) শরীআত বিরোধী ঃ যেহেতু এ এক বিশেষ ইবাদাত। এর পূর্ণ ধরণ শরীআত প্রণেতা কর্তৃক সীমিত। এ ধরণের ঘোষণার সেখান থেকে সবুজ সংকেত না থাকায় এ কাজ শরীআত বিরোধী যা বিদ্আত হিসাবেই গণ্য হবে।

(৩) স্বলাত বিমুখ করতে সহায়ক ঃ দুই ঈদ বছরে মাত্র একবার করে হাযির হয় খুশির জোয়ার নিয়ে। এ জোয়ারের মূল পর্বের সময়ের ঘোষণা প্রতিবার দিতে হবে বা পাড়ায় পাড়ায় দিয়ে বেড়াতে হবে এটা যথেষ্ট পরিতাপের। পরিতাপের এ জন্যই যে, তাহলে কি এর পালনকারীরা এ উৎসব হতে বিমুখ? বিষয়টি অনুরূপই। যে অফিস থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়, সেখানে সুস্থ প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যহ পাঁচ বার হাজিরা দেওয়া আবশ্যিক। এর এক পঞ্চমাংশও যদি পালিত হয় তবে স্থিরকৃত সময় সম্বন্ধে অবগতি না পাওয়ার কোনোই প্রশ্ন নেই। বাড়ির মাত্র একজন সদস্যও যদি এ রকম হাজিরা দেয় তবুও প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে সংবাদ এমনিতেই পৌঁছে যাবে। কিন্তু তা হয় না। ফলে এ রকম ঘোষণার পড়ে প্রয়োজন। আর ঘোষক অফিসের আধিকারিকগণ অফিসে হাজির না হওয়া কাষ্টমারদের নিয়ে চিন্তিত। সমাধান স্বরূপ অফিসে হাজির না হওয়াকে সমর্থন জানিয়ে ব্যবস্থা করছেন মাইকে ঘোষণার। সহায়তা করছেন স্বলাত বিমুখ থাকতে। বকলমে এ বার্তা দিচ্ছেন যে, স্বলাত আদায়ে অভ্যস্ত না হলেও মুসলিম থাকা যায়, স্বলাত বিমুখ তুমি মসজিদ ভুললেও মসজিদ তোমায় ভুলেনি, তুমি মুসলিম তাই তুমি পিছিয়ে থাকলেও তোমার নিকট সংবাদ পৌঁছে দিতে আমরা দায়িত্বশীলরা নেই পিছিয়ে।

মাইকে ঈদের ঘোষণার প্রয়োজন কখন ঃ ২৯শে রমাযান ইশার স্বলাত পর্যন্ত চাঁদের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। যথারীতি ৩০শে রমাযানের উদ্দেশ্যে তারাবীর স্বলাতও আদায় হয়েছে। জনগণ জেনে নিয়েছে আগামীকাল ঈদ্ নয়, ৩০শে রমাযান। এরপরেও যদি রাত্রে বা ৩০শে রমাযান ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত চাঁদের নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যায় তবে এ রকম পরিস্থিতিতে তৎক্ষণাৎ মাইকের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়াতে কোনো অসুবিধা হবে না ইন্শা-আল্লাহ্। সকল পাড়ার মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিলেই যথেষ্ট হবে। যদি এ রকম ঘোষণা যথেষ্ট মনে না করা হয় তবে রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে প্রচার করা যেতে পারে। কেননা এ এক ব্যতিক্রমী বিষয়। যত শীঘ্র সম্ভব জনগণকে অবগতি দিয়ে সিয়াম ভাঙাতে হবে। যাওয়ালের (দিনের মধ্যভাগে সূর্য ঢলে যাওয়ার) পূর্বে ঈদ পালন সম্ভব হলে সে দিনেই ঈদ পালন করতে হবে। অন্যথায় সিয়াম ভেঙে পরের দিন ঈদ পালন করতে হবে *(অর্থ বিশ্লেষণ ঃ ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় — নতুন চন্দ্র দর্শণে সাক্ষ্য, হাঃ নং ১৬৫৩; আবূ দাউদ, অধ্যায় — শাওয়ালের চন্দ্র দর্শন দু জনের সাক্ষ্য হাঃ নং ২৩৩৯, সূত্র সহীহ্)*।

উপসংহার ঃ দ্বীনে ইসলামের কোনো কোনো সুন্নাত উম্মাত কর্তৃক পালিত না হলে ফাযীলাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে ঠিকই, গুনাহগার হতে হবে না, কিন্তু কোনো একটি ক্ষেত্রেও নাবীর নীতি বহির্ভূত কোনো পদ্ধতি সংযোজিত হলে তা হবে নাবীর আদর্শ বিরোধী, বিদ্আত। এ রকম আমল বাহ্যত কোনো সমস্যার মনে না হলেও কিংবা যুক্তির নিরিখে অধিক ফলপ্রসূ বলে মনে হলেও তাতে কোনো নেকী পাওয়া তো যাবেই না বরং হতে হবে গুনাহগার। কেনান ইসলাম কোনো যুক্তি প্রসূত দ্বীনের নাম নয়। আর এ জন্যই যুক্তি বিরোধী হলেও অযূ করে মোজা পরা অবস্থায় অযুর সময় ধোয়ার বিকল্প হিসাবে পায়ের মাসাহ্র পদ্ধতি হল শুধু পায়ের উপরিভাগে মাসাহ্ করা। যুক্তি খাটিয়ে কেউ যদি পায়ের সমগ্র অংশে কিংবা নিম্নভাগে মাসাহ্ করেন তবে মাসাহ হবেই না বরং রসূল নীতি বিরোধীতার জন্য হতে হবে অপরাধী। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হলেও নাবীর আদর্শ বিরোধী কাজ হল আসমানী নীতির বিলংঘন। কাজেই এ রকম সকল কাজ ঈমানদারদের পরিত্যাগ করা একান্তই কর্তব্য। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যে নিয়ম ও পদ্ধতিতে শরীআত সম্পাদন করেছেন সেই নিয়ম ও পদ্ধতিতে নিজেকে সাজিয়ে তোলা হল রসূল প্রেমের প্রতীক। কাজেই দুই ঈদের ক্ষেত্রেও রসূল নীতিই আমাদের জন্য হল উত্তম আদর্শ।

পরিশেষে আল্লাহ্র কাছে দুআ — হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্যে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আদর্শ দান করো, দূর করো আমাদের মধ্য থেকে তাঁর নীতি বিরোধী সকল ক্রিয়াকলাপ — আমীন।

৩১ পর্ব

তায়াম্মুমের বিবরণ بَابُ التَّيَـمُّمِ

পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাতে বিসমিল্লাহ্ পড়ে ❶ (শুরু করতে হবে) এবং অযূ নষ্টের কারণগুলিই তায়াম্মুম নষ্টের কারণ ❷	نَـاوِيًـا مُسَـمِّيًـا وَ نَوَاقِضُهُ نَوَاقِضُ الْوُضُوْءِ.

(১) সমস্ত আমলের মত তায়াম্মুমেও নিয়্যাত করা জরুরী এবং তায়াম্মুম যেহেতু অযূর স্থলাভিষিক্ত তাই বিসমিল্লাহ্ পড়তে হবে (বিসমিল্লাহ্‌র বিষয়ে বিস্তারিত জানতে باب الوضوء বাবুল অযূ বা অযূর অধ্যায় দেখুন)।

(২) নিঃসন্দেহে এটি প্রমাণিত যে, মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার মতই। তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি অযূকারী ব্যক্তির মতই সমস্ত আমল করতে পারবে। কুরআন ও সুন্নাহতে এর বিপরীতে কোনো দলীল নেই এবং সাহেবুর রায় বা বিদ্বজ্জনদেরও এ বিষয়ে কোনো সঠিক মত নেই। সেজন্য অযূ নষ্টের কারণগুলিই হল তায়াম্মুম নষ্টের কারণ। যে কাজের জন্য তায়াম্মুম করা হয় সে কাজ সমাপ্ত হলেই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায় বা এছাড়া অন্যকাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়—এ দাবী ভিত্তিহীন।[১]

৮৯ । স্বলাত চলাকালীন যদি পানি পাওয়া যায়

তাহলে কি তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায় বা স্বলাত সম্পূর্ণ করে নিতে হবে? বাস্তব এটাই যে, পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায় যখন মানুষ পানি ব্যবহারের সামর্থ রাখবে। সুতরাং পানি পাওয়ার পর যদি হাদাসে আসগারের (যেমন প্রস্রাব, পায়খানা ও বাতকম্পের) কারণে তায়াম্মুম করে থাকলে অযূ করতে হবে আর হাদাসে আকবারের অর্থাৎ ফরয গোসলের কারণে তায়াম্মুম করে থাকলে গোসল করতে হবে। এর দলীল নীচে বর্ণিত হল :

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''পবিত্র মাটি মুসলিমদের পবিত্র করবে, যদিও দশ বছর পানি না পাওয়া যায় কিন্তু فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَـهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ যখন পানি পেয়ে যাবে তখন শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। নিশ্চয় এতেই কল্যাণ নিহিত আছে।[২]

(ইবনু কুদামা, হাম্বেলী) — যখন তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি পানি পেয়ে যাবে আর সে স্বলাতে থাকবে, তখন সে স্বলাত পরিত্যাগ করে অযূ করবে বা জানাবাতের অবস্থায় তায়াম্মুম করে থাকলে, গোসল করবে এবং স্বলাত সম্পন্ন করবে।[৩]

(আবূ হানীফা, সওরী রহঃ) — এ কথাই বলেছেন।

(মালেক, শাফেয়ী, ইবনু মুনযির রহঃ) — মানুষ স্বলাতে থাকলে স্বলাত সম্পূর্ণ করে নিবে।[৪]

১। আস্ সাইলুল জাররার ১/১৪০।

২। সহীহ্ : সহীহ্ আবূ দাউদ ৩২১, ৩২২, কিতাবুত্ তাহারাত : বাবুল জুনবে ইয়াতায়াম্মামু, আবূ দাউদ ৩৩২, ৩৩৩, আহমাদ ৫/১৪৬-১৪৭, তিরমিযী ১২৪, নাসায়ী ১/১৭১, দারাকুতনী ১/১৮৭, হাকিম ১/১৭৬-১৭৭, বাইহাক্বী ১/২১২, ইবনু আবী শাইবা ১/১৫৬।

৩। আল্ মুগনী লি ইবনে কুদামা ১/৩৪৭।

৪। বাদায়েউস সানায়ে ১/৫৭, আল্ আসল ১/১০৫, আল্ মাজমূ ২/৩৬৪, আল্ মুহাল্লা ২/১২২, আল্ মুগনী ১/৩৪৭।

রাজেহ বা তুলনামূলক বেশি সঠিক : প্রথম মত অর্থাৎ ইবনু কুদামা ও হাম্বেলীর মতটিই বেশি সঠিক (কেননা আমলের উপস্থিতিতে নিয়্যাত সমাপ্ত হয়ে যায়)।[১]

অবশ্য উল্লিখিত فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ (অতঃপর পানি পাওয়া গেলে পানির ব্যবহার করতে হবে) হাদীসের সাধারণ হুকুমের মধ্যে একটি খাস বা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। তা হল স্বলাত শেষে যদি স্বলাতের সময়ের মধ্যেই পানি পাওয়া যায়, তাহলে অযূ করে দ্বিতীয়বার স্বলাত সম্পাদন করা জরুরী নয়। যেমন আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, ''দুজন মানুষ সফরে বের হল। যখন স্বলাতের সময় হল তখন তাদের নিকটে পানি ছিল না। তাই তারা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে স্বলাত সম্পাদন করল। অতঃপর স্বলাতের সময়ের মধ্যে তারা পানি পেল। তাদের একজন অযূ করে দ্বিতীয়বার স্বলাত আদায় করল কিন্তু দ্বিতীয়জন করল না। তারা দুজনে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে এল এবং ঘটনার বিবরণ দিল। যে ব্যক্তি স্বলাত দ্বিতীয়বার পড়েনি তাকে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন — اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ اَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ তুমি সুন্নাত মোতাবেক কাজ করেছ এবং তোমার স্বলাত তোমার জন্য যথেষ্ট। আর অপরজনকে বললেন — لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ তোমার দ্বিগুন নেকী হাসিল হয়েছে।[২]

(চার ইমাম) — এ কথাই বলেছেন।[৩]

৯০ । স্বলাতের সময় শেষ হয়ে গেলে কি তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়?

(শওকানী রহঃ) — স্বলাতের সময় সমাপ্ত হয়ে গেলে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাওয়ার দাবীর কোনো ভিত্তি নেই এবং এর কোনও দলীলও নেই।[৪] কিন্তু হাম্বেলীদের নিকটে সময় শেষ হয়ে গেলে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়।[৫]

বিবিধ

৯১। কেবল মাটি দিয়েই কি তায়াম্মুম করতে হবে?

(ক) আল্লাহ্ তাআলার ফরমান — فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا (المائده ـ ٦) তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর (সূরা মায়েদা : ৬)।

(খ) হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''অন্যান্য উম্মতের থেকে আমাদের অতিরিক্ত তিনটি মর্যাদা রয়েছে। আমাদের স্বলাতের সারি ফেরেশতাদের সারির মতই। পৃথিবীকে আমাদের জন্য মাসজিদ করা হয়েছে আর وَ جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ যখন আমরা পানি পাব না, তখন

১। নাইলুল আওতার ১/৩৯৩।

২। সহীহ্ : সহীহ্ আবূ দাউদ ৩২৭, কিতাবুত্ তাহারাত : বাবুন ফিল মুতাইয়াম্মামে ইয়াজেদুল মাআ বা'দা মা ইউসাল্লি ফিল ওয়াক্তে, আবূ দাউদ ৩৩৮, নাসায়ী ১/২১৩, হাকিম ১/১৭৮, দারাকুতনী ১/১৮৮।

৩। নাইলুল আওতার ১/৩৯৩।

৪। আস্ সাইলুল জার্রার ১/১৪১।

৫। আল মুগনী ১/৯৩৫০।

পৃথিবীর মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে।"[১]

কামূসের লেখক : صعيد এর অর্থ হল মাটি বা ভূমির উপরের অংশ।[২]

মুনজিদের লেখক : صعيد এর অর্থ কবর, রাস্তা এবং ভূমির উপরের অংশ।[৩]

(আহমাদ মাকরী) — صعيد এর অর্থ ভূমির উপরের অংশ মাটি বা অন্য কিছু।[৪]

(ইমাম সাআলাবী) — صعيد হল ভূমির উপরের মাটি।[৫]

(ইমাম যুজাজ) — صعيد ভূমির উপরের অংশ - মাটি হোক বা অন্য কিছু। আর এ বিষয়ে অভিধান বিশারদদের নিকটে কোনও মতপার্থক্য আমার জানা নেই।[৬]

ইমাম আযহারী : অধিকাংশ আলেমদের এটাই মত যে আল্লাহ্‌র ফরমান صَعِيدًا طَيِّبًا এর অর্থ পবিত্র মাটি।[৭]

(শাফেয়ী, আহমাদ, দাউদ রহঃ) — কেবল মাটি দিয়েই তায়াম্মুম করা যাবে।

(মালেক, আবূ হানীফা রহঃ) — ভূমির উপরিভাগে যাই থাকুক তা দিয়েই তায়াম্মুম করা সঠিক। ইমাম আতা, ইমাম আওযায়ী, ইমাম সওরীরও এটাই মত।[৮]

(ইবনু কুদামা, হাম্বেলী রহঃ) — صعيد এর অর্থ হল মাটি।[৯]

(সাইয়েদ সাবেক রহঃ) — পবিত্র মাটি এবং ভূমির সব উপাদান দিয়েই তায়াম্মুম করা বৈধ। যেমন বালি, পাথর ইত্যাদি।[১০]

(শাওকানী রহঃ) — অভিধানবিদ্‌রা এর অর্থ নিয়েছেন মাটি বা ভূমির উপরের অংশ যেমন কামূসের লেখক ও অন্যান্যরা। বিভিন্ন হাদীস দুটি অর্থের মধ্যে একটি অর্থাৎ মাটিকে নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন وَ جُعِلَ التُّرَابُ لِى طَهُوْرًا অর্থাৎ মাটিকে আমার জন্য পবিত্রতা হাসিলের মাধ্যম করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে কেবল মাটি দিয়েই তায়াম্মুম করা হত। অন্য কোনো বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করার প্রচলন ছিল না।[১১]

(সিদ্দিক হাসান খাঁ) — এ কথাই বলেছেন।[১২]

১। মুসলিম ৫২২, কিতাবুল মাসাজিদ অ মাওয়াযেউস স্বলাত, ইবনু আবী সাইবা ১/১৫৭, তায়ালেসী ৪১৮, নাসায়ী ৫/১৫, ইবনু খুযাইমা ২৫৬, দারাকুতনী ১/১৭৫।
২। আল্‌ কামূসুল মুহীত পৃঃ ২৬৬।
৩। আল্‌ মুনজিদ ৪৭০।
৪। আল্‌ মিসবাহ্‌ ১২৯।
৫। ফিকহুল লুগা পৃঃ ২৮৭।
৬। মাআনিল কুরআন অ এরাবুহ ২/৫২।
৭। নাইলুল আওতার ১/৩৮৬।
৮। আল্‌ মাজমূ ২/২৭৯, আল্‌ মুগনী ১/২৩৬, বাদায়েউস সানায়ে ১/৫৪, হাশিয়াতুদ্‌ দাসূকী ১/১৫৬, আল্‌ মুহাল্লা ২/১৩৩, আল্‌ মুগনী ১/৩২৪।
৯। আল্‌ মুগনী ১/৩২৪।
১০। ফিকহুস সুন্নাহ্‌ ১/৭১।
১১। আস্‌ সাইলুল জাররার ১/১৩১।
১২। আর্‌রওযুন নাদিয়্যা ১/১৭৬।

রাজেহ বা তুলনামূলক বেশি সঠিক : صعيد শব্দটির অর্থ ভূমির উপরের অংশ অধিকাংশ অভিধানবিদ্দের ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট, এজন্য ভূপৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত প্রত্যেক বস্তু দিয়েই তায়াম্মুম করা বৈধ। হাদীসে বর্ণিত মাটি কুরআনে বর্ণিত **صعيد** এর অর্থকে নির্দিষ্ট করতে পারে না বরং এর একটি অংশকে স্পষ্ট করে। অর্থাৎ **صعيد** এ যেসব বস্তু রয়েছে তার মধ্যে মাটি হল একটি। খাস করে হাদীসে মাটির বিবরণ আসার কারণ হল এই যে, ভূমির উপরিভাগ সাধারণতঃ মাটিই হয়। সুতরাং তা দিয়েই তায়াম্মুম করতে হয়। কিন্তু যেখানে বালি থাকবে, সেখানে বালি দিয়েই তায়াম্মুম করতে হবে। এভাবেই ভূমির উপরিভাগে যেখানে যা থাকবে, তা দিয়েই তায়াম্মুম করতে হবে (আল্লাহ্ই ভালো জানেন)।

৯২। স্বলাতের সময় শেষ হওয়ার আশংকা হলে তায়াম্মুম

পানি ব্যবহারের সামর্থ থাকা সত্বেও এই রকম পরিস্থিতিতে তায়াম্মুম করতে হবে না অযূ করা জরুরী যদিও স্বলাতের সময় শেষ হয়ে যায়?

(শাফেয়ী ও হাম্বেলীগণ) : এই অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ নয়।

(হানাফীগণ) : জানাযা এবং ঈদের স্বলাত বাদ যাওয়ার আশংকা থাকলে পানি থাকা সত্বেও তায়াম্মুম করা জায়েয এবং এভাবেই কসুফ বা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের স্বলাত এবং ফরযের সুন্নাত বাদ চলে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করা যাবে।[১]

রাজেহ বা তুলনামূলক বেশি সঠিক : শাফেয়ীদের অবস্থান রাজেহ। কেননা সুস্থ ও সবল অবস্থায় যখন পানি না থাকবে কেবল তখনই তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ্র ফরমান —فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا (المائده ـ ٦) পানি না পেলে তায়াম্মুম কর (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৬)।

(শওকানী, আলবানী) — এ কথাই বলেছেন।[২]

৯৩। পানি রয়েছে কিন্তু যথেষ্ট নয়?

এই অবস্থায় ব্যক্তি প্রথমে নিজের কাপড় ও শরীরের ময়লা পরিষ্কার করবে বা প্রস্রাব-পায়খানার জন্য পানি ব্যবহার করবে। কেননা অযূর পূর্বে শরীয়তে এ সমস্ত কাজ করার নির্দেশ রয়েছে।[৩]

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস — اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ করব, তখন সাধ্যমত সে কাজ তোমরা করবে।[৪]

এজন্য সাধ্যমত পবিত্রতার জন্য পানি ব্যবহার করতে হবে (পানি কম হলে সব ছেড়ে দিয়ে কেবল তায়াম্মুম করা উচিত নয়)।[৫]

১। মুগনিল মুহতাজ ১/৮৮, কাশ্শাফুল ক্বানা ১/২০৬, আদ্দুররুল মুখতার ১/২২৩, মারাকুল ফাল্লাহ্ ১৯, বাদায়েউস সানায়ে ১/১৫, ফাত্হুল কাদীর ১/৯৬।

২। আস্সাইলুল জাররার ১/১২৬, তামামুল মিন্নাহ্ ১৩২।

৩। আস্সাইলুল জাররার ১/১৩৬।

৪। বুখারী ৭২৮৮, কিতাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ও সুন্নাহ : বাবুল ইকতিদা বিসুনানি রাসূলিল্লাহ্, মুসলিম ১৩৩৭, আহমাদ ২/২৫৮, হুমাইদী ১১২৫, আবূ ইয়ালা ৬৩০৫।

৫। নাইলুল আওতার ১/৩৮৭।

৯৪। সামর্থহীন ও দূর্বল অসুস্থ মানুষ কী করবে?

এমন মানুষ যে নিজে নড়াচড়া করে পানি হাসিল করতেও পারে না এবং এমন কাউকেও পায় না যে তাকে পানির ব্যবস্থা করে দেবে। এই রকম অবস্থায় তায়াম্মুম করে নেওয়া তার জন্য মুবাহ ও সঠিক হবে। কেননা সে নিজেই এমন লোকের মত যে গভীর কুঁয়োতে পানি দেখতে পায় কিন্তু পানি হাসিল করার কোনো মাধ্যম বা উপায় তার নেই।

(ইবনু কুদামা) — এ কথাই বলেছেন।[১]

৯৫। যদি কিছুই না পাওয়া যায় তাহলে কি তাহারাত ছাড়াই স্বলাত বিশুদ্ধ হবে?

তায়াম্মুমের অনুমতি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, যখন আয়েশার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) গলার হার হারিয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) খোঁজার জন্য কিছু লোককে পাঠিয়েছিলেন। স্বলাতের সময় হয়ে গেলে তাদের নিকটে পানিও ছিল না এবং তায়াম্মুমের বিধানও তখন আসেনি — فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ তাই তারা অযূ ছাড়াই স্বলাত পড়েছিলেন। ফিরে এসে তাঁরা আল্লাহ্‌র রসূলের নিকটে বিষয়টিও উল্লেখ করলে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২]

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি পানি ও মাটি কিছুই না থাকে তাহলে অযূ ও তায়াম্মুম ছাড়াই স্বলাত বৈধ। কেননা এই অবস্থায় স্বলাত নিষিদ্ধ হলে আল্লাহ্‌র রসূল তার ব্যাখ্যা দিতেন। সেই সময়ের পানি না থাকা, বর্তমানে পানি ও মাটি ইত্যাদি না থাকার সমার্থক।

(শাফেয়ী, আহমাদ, জমহুর মুহাদ্দেসীন) — সকলেই এমন অবস্থায় আদায়কৃত স্বলাতকে বৈধ বলেছেন। অবশ্য দ্বিতীয়বার স্বলাত আদায় করতে হবে কি না এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে :—

(শাফেয়ী রহঃ) — স্বলাত পুনরায় পড়তে হবে, কেননা এটি বিরল অজুহাত।

(আহমাদ, ইবনু মুনযির রহঃ) — পুনরায় স্বলাত আদায় করা ওয়াজিব নয়, কেননা ওয়াজেব হলে আল্লাহ্‌র রসূল তাদের অবশ্যই তার আদেশ দিতেন।

(মালেক, আবূ হানীফা রহঃ) — এই অবস্থায় স্বলাত আদায়ই করবে না। (অবশ্য আহনাফদের নিকটে এর কাযা করে স্বলাত আদায় ওয়াজেব, ইমাম মালেকের নিকটে ওয়াজেব নয়)।

(নওয়াবী রহঃ) — এই রকম অবস্থায় স্বলাত আদায় করে নেওয়া উত্তম। কিন্তু পরে অযূ বা তায়াম্মুম করে পুনরায় আদায় করা ওয়াজেব।[৩]

রাজেহ : ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর মতামত সুন্নাতের বেশি নিকটবর্তী (আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন)।

বাস্তবে এ রকম ঘটনা খুবই কম হয়। কিন্তু এর সম্ভাবনা তো রয়েছেই। যেমন কোনো মুসলিম মুজাহিদ দুশমনের কয়েদী হয়ে যেতে পারে এবং এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে যে, পানি ও মাটি কিছুই পাচ্ছে না। তাছাড়া এমন অসুস্থ মানুষ যে নিজে চলাফেরা করতে পারে না বা তাকে পানি বা মাটি দেওয়ার মত কোনো লোকও নেই, এমন অবস্থায় তাদের কী করা উচিত? নিশ্চয়ই সামর্থ অনুযায়ী আমল করার হুকুম রয়েছে। এজন্য অযূ ও তায়াম্মুম ছাড়াই স্বলাত আদায় করে নেওয়া উচিত।

১। আল্ মুগনী ১/৩১৬।

২। সহীহ্ : সহীহ্ আবূ দাউদ ৩০৯, কিতাবুত তাহারাত : বাবুত তায়াম্মুম, আবূ দাউদ ৩১৭, বুখারী ৩৩৪, ইবনু মাজাহ্ ৫৬৮, আহমাদ ৬/৫৭, নাসায়ী ১/১৬৩, হুমাইদী ১৬৫।

৩। ফাতহুল বারী ১/৫৮৫, নাইলুল আওতার ১/৩৯৪, আল্ মাজমূ ২/৩২১।

শেষ পর্ব

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ব্যভিচার ও সমকাম

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

রোগাক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা

তাওহীদ বিরোধী উক্ত রোগে কেউ আক্রান্ত হলে তাকে সর্বপ্রথম এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সে উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে শুধু মূর্খতা এবং গাফিলতির দরুনই। অতএব সর্বপ্রথম তাকে আল্লাহ্ তাআলার তাওহীদ তথা একত্ববাদ, তাঁর সাধারণ নীতি ও নিদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। অতঃপর তাকে এমন কিছু প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদত করতে হবে যার দরুন সে উক্ত মত্ততা থেকে রক্ষা পেতে পারে। এরই পাশাপাশি সে আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবিনয়ে সর্বদা এ দুআ করবে যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন তাকে উক্ত রোগ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি দেন। বিশেষ করে সম্ভাবনাময় স্থান, সময় ও অবস্থায় দুআ করবে। যেমন আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়, রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ, সিজদাহ্ এবং জুমআর দিনের শেষ বেলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্তাকারে প্রস্তাবিত চিকিৎসা সমূহ

১। প্রথমে আল্লাহ্ তাআলার নিকট উক্ত গুনাহ্ থেকে খাঁটি তাওবা করে নিন। কারণ, কেউ আল্লাহ্ তাআলার নিকট একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য অথবা তাঁরই কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাওবা করে নিলে আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তা কবুল করেন এবং তাকে সেভাবেই চলার তাওফীক দেন।

২। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি দৃঢ় একনিষ্ঠ হোন। এটিই হচ্ছে এর একান্ত মহৌষধ। আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম)-কে এ একনিষ্ঠতার কারণেই ইশ্‌ক্ব এবং প্রায় নিশ্চিত ব্যভিচার থেকে রক্ষা করেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَ الْفَحْشَآءَ، اِنَّـهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ.

অর্থাৎ তাকে (ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে) মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্যই এভাবে আমি আমার নিদর্শন দেখালাম। কারণ, তিনি ছিলেন আমার একান্ত একনিষ্ঠ বান্দাহ্দের অন্যতম (সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ২৪)।

৩। ধৈর্য ধরুন। কারণ, কোনো অভ্যাসগত কঠিন পাপ ছাড়ার জন্য ধৈর্যের একান্তই প্রয়োজন। সুতরাং ধৈর্য ধারণে বার বার কসরত করতে হবে। এমনিভাবেই ধীরে ধীরে এক সময় ধৈর্যধারণ অভ্যাসে পরিণত হবে।

আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

وَ مَـنْ يَّـتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ، وَ مَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করে আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাকে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দেন। আল্লাহ্ তাআলা কাউকে এমন কিছু দেননি যা ধৈর্যের চাইতেও উত্তম এবং বিস্তর কল্যাণকর (বুখারী ১৪৬৯, ৬৪৭০, মুসলিম ১০৫৩)।

এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যে সকল কাজের পরিণতি-শাস্তি, লজ্জা, আফসোস, লাঞ্ছনা, ভয়, চিন্তা বা অস্থিরতা হতে পারে এমন কাজে মনের কোনো চাহিদা পূরণ করা থেকে ধৈর্য ধারণ করা অনেক সহজ। তাই একেবারে শুরুতেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

৪। মনের বিরোধিতা করতে শিখুন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মনের বিরোধিতা করবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَ الَّـذِيْـنَ جَـاهَـدُوْا فِيْـنَا لَنَهْدِيَـنَّهُمْ سُبُلَـنَا ، وَ اِنَّ لَمَعَ الْمُحْسِنِـيْنَ.

অর্থাৎ যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের সাথেই রয়েছেন (সূরা আনকাবূত : ৬৯)।

৫। আল্লাহ্ তাআলা যে সর্বদা আপনার কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই থাকেন তা অনুভব করতে শিখুন। সুতরাং উক্ত

কাজ করার সময় মানুষ আপনাকে না দেখলেও আল্লাহ্ তাআলা যে আপনার প্রতি দেখছেন তা ভাবতে হবে। এরপরও যদি আপনি উক্ত কাজে লিপ্ত হোন তখন অবশ্যই এ কথা ভাবতে হবে যে, আল্লাহ্ তাআলার সম্মান ও মর্যাদা আপনার অন্তরে নেই। তাই আল্লাহ্ তাআলা আপনার উক্ত কর্ম দেখলেও আপনার এতটুকুও লজ্জা হয় না। আর যদি আপনি এমন বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনার কর্মকাণ্ড দেখছেনই না তাহলে তো আপনি নিশ্চয়ই কাফির।

৬। জামাআতে স্বলাত পড়ার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হোন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْـهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই স্বলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে (সূরা আনকাবূত : ৪৫)।

৭। বেশি বেশি নফল সিয়াম রাখতে চেষ্টা করুন। কারণ, সিয়ামের মধ্যে বিশেষ ফযীলতের পাশাপাশি উত্তেজনা প্রশমনেরও এক বাস্তবমুখী ব্যবস্থা রয়েছে। যেমনিভাবে সিয়াম আল্লাহ্‌ভীরুতা শিক্ষা দেওয়ার জন্যও এক বিশেষ সহযোগী।

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

অর্থাৎ হে যুবকরা ! তোমাদের কেউ সঙ্গমে সক্ষম হলে সে যেন দ্রুত বিবাহ করে নেয়। কারণ, বিবাহ তার চোখকে নিম্নগামী করবে এবং তার লজ্জাস্থানকে হিফাযত করবে। আর যে বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে যেন সিয়াম পালন করে। কারণ, সিয়াম তার জন্য একান্ত যৌন উত্তেজনা প্রতিরোধক (বুখারী : ৫০৬৫, মুসলিম ১৪০০)।

৮। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করুন। কারণ, কুরআন হচ্ছে সর্ব রোগের চিকিৎসা। তাতে নূর, হিদায়াত, মনের আনন্দ ও প্রশান্তি রয়েছে। সুতরাং উক্ত রোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত, মুখস্থ ও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা অবশ্যই উচিত যাতে তার অন্তর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যায়।

৯। বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিকির করুন। কারণ, আল্লাহ্ তাআলার যিকিরে অন্তরের বিরাট একটা প্রশান্তি রয়েছে এবং যে অন্তর সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে ব্যস্ত থাকে শয়তান সে অন্তর থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। সুতরাং এ জাতীয় ব্যক্তির জন্য যিকির অত্যন্ত উপকারী।

১০। আল্লাহ্ তাআলার সকল বিধি-বিধানের প্রতি যত্নবান হোন। তা হলে আল্লাহ্ তাআলাও আপনার প্রতি যত্নবান হবেন। আপনাকে জিন ও মানব শয়তান এবং অন্তরের কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করবেন। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা আপনার ধার্মিকতা, সততা, মানবতা এবং সম্মানও রক্ষা করবেন।

১১। অতি তাড়াতাড়ি বিবাহ কার্য সম্পাদন করুন। তা হলে যৌন উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সহজেই আপনি একটি হালাল ক্ষেত্র পেয়ে যাবেন।

১২। জান্নাতের হুরের কথা বেশি বেশি স্মরণ করুন। যাদের চোখ হবে বড় বড় এবং যারা হবে অতুলনীয় সুন্দরী লুক্কায়িত মুক্তার ন্যায়। নেক্‌কার পুরুষদের জন্যই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদেরকে পেতে হলে দুনিয়ার এ ক্ষণিকের অবৈধ স্বাদ পরিত্যাগ করতেই হবে।

১৩। শ্মশ্রুবিহীন সে প্রিয় ছেলেটি থেকে খুব দূরে থাকুন। যাকে দেখলে আপনার অন্তরের সে লুক্কায়িত কামনা-বাসনা দ্রুত জাগ্রত হয়। এমন দূরে থাকবেন যে, সে যেন কখনো আপনার চোখে না পড়ে এবং তার কথাও যেন আপনি কখনো শুনতে না পান। কারণ, বাহ্যিক দূরত্ব অন্তরের দূরত্ব সৃষ্টি করতে অবশ্যই সহায়ক।

১৪। তেমনিভাবে উত্তেজনাকর সকল বস্তু থেকেও দূরে থাকুন যেগুলো আপনার লুক্কায়িত কামনা-বাসনাকে দ্রুত জাগ্রত করে। অতএব মহিলা ও শ্মশ্রুবিহীন ছেলেদের সাথে মেলামেশা করবেন না। বিশ্রী ছবি ও অশ্লীল গান শুনবেন না। আপনার নিকট যে অডিও ভিডিও ক্যাসেট, ছবি ও চিঠি রয়েছে সবগুলো দ্রুত নস্যাৎ করে দিন। উত্তেজনাকর খাদ্য দ্রব্য আপাতত বন্ধ রাখুন। তা আর কিছু দিনের জন্য গ্রহণ করবেন না। ইতিপূর্বে যেখানে উক্ত কাজ সম্পাদিত হয়েছে সেখানে আর যাবেন না।

১৫। লাভজনক কাজে ব্যস্ত থাকুন। কখনো একা ও অবসর

থাকতে চেষ্টা করবেন না। পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। ইত্যবসরে ঘরের প্রয়োজন সমূহ পূরণ করতে পারেন। কুরআন শরীফ মুখস্থ করতে পারেন অথবা অন্ততপক্ষে বেচাকেনা নিয়েও ব্যস্ত হতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৬। সর্বদা শয়তানের ওয়াসওয়াসা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করুন। কোনো কুমন্ত্রণাকে একটুর জন্যও অন্তরে স্থান দিবেন না।

১৭। নিজের মনকে দৃঢ় করুন। কখনো নিরাশ হবেন না। কারণ, এ ব্যাধি এমন নয় যে তার কোনো চিকিৎসা নেই। সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন কেন?

১৮। উচ্চাকাঙ্খী হোন। উচ্চাভিলাসের চাহিদা হচ্ছে এই যে, আপনি সর্বদা উন্নত গুণে গুণান্বিত হতে চাইবেন। অরুচিকর অভ্যাস ছেড়ে দিবেন। লাঞ্ছনার স্থান সমূহে কখনো যাবেন না। সমাজের সম্মানি ব্যক্তি সেজে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব হাতে নিবেন।

১৯। অভিনব বিরল চিকিৎসা সমূহ থেকে দূরে থাকুন। যেমন কেউ উক্ত কাজ ছাড়ার জন্য এভাবে মানত করলো যে, আমি যদি এমন কাজ আবারো করে ফেলি তা হলে আল্লাহ্ তাআলার জন্য ছয় মাস সিয়াম রাখা অথবা দশ হাজার রিয়াল সাদাকা করা আমার উপর বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। তেমনিভাবে এ বলে কসম খেলো যে, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি আর এমন কাজ করবো না। শুরুতে কসমের কাফ্ফারার ভয়ে অথবা মানত ওয়াজিব হওয়ার ভয়ে উক্ত কাজ করা থেকে বেঁচে থাকলেও পরবর্তীতে তা কাজে নাও আসতে পারে।

কখনো কখনো কেউ কেউ কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী কোনো কোনো ওষুধ সেবন করে। তা একেবারেই ঠিক নয়, কারণ তাতে হিতে বিপরীতও হতে পারে।

২০। নিজের মধ্যে প্রচুর লজ্জাবোধ জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ লজ্জাবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যা কল্যাণই কল্যাণ এবং তা ঈমানেরও একটি বিশেষ অঙ্গ বটে। লজ্জাবোধ মানুষকে ভালো কাজ করতে উৎসাহ যোগায় এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।

নিম্নোক্ত কয়েকটি কাজ করলে যে কোনো ব্যক্তির মাঝে ধীরে ধীরে লজ্জাবোধ জন্ম নেয় ঃ

(ক) বেশি বেশি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জীবনী পড়বেন।

(খ) সাহাবায়ে কিরাম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও প্রসিদ্ধ লজ্জাশীল সাল্‌ফে সালিহীনদের জীবনী পড়বেন।

(গ) লজ্জাশীলতার ফলাফল সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করবেন। বিশেষ করে লজ্জাহীনতার ভীষণ কুফল সম্পর্কেও সর্বদা ভাববেন।

(ঘ) এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবেন যা বললে বা করলে লজ্জাবোধ কমে যায়।

(ঙ) লজ্জাশীলদের সাথে বেশি বেশি উঠাবসা করবেন এবং লজ্জাহীনদের থেকে একেবারেই দূরে থাকবেন।

(চ) বার বার লজ্জাশীলতার কসরত করলে একদা সে ব্যক্তি অবশ্যই লজ্জাশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ছ) বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে এমন গুণ থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তখনই সে বড় হলে তা তার বিশেষ কাজে আসবে।

(জ) ওয়াহাব বিন্ মুনাব্বিহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন :

إِذَا كَانَ فِيْ الصَّبِيِّ خَصْلَتَانِ : الْحَيَاءُ وَ الرَّهْبَةُ رُجِيَ خَيْرُهُ.

অর্থাৎ কোনো বাচ্চার মধ্যে দুটি গুণ থাকলেই তার কল্যাণের আশা করা যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে লজ্জা আর অপরটি হচ্ছে ভয়-ভীতি (আলফাহিশাতু আমালু কাওমি লূত)।

ইমাম আসমায়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন :

مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ.

অর্থাৎ লজ্জা যার ভূষণ হবে মানুষ তার দোষ দেখতে পাবে না (আলফাহিশাতু আমালু কাওমি লূত)।

২১। যারা অন্যজন কর্তৃক এ জাতীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে (বিশেষ করে তা উঠতি বয়সের ছেলেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) তাদের একান্তই কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা সতর খোলা থেকে সতর্ক থাকা। চাই তা খেলাধূলার সময় হোক বা অন্য কোনো সময়। কারণ এরই মাধ্যমে সাধারণত অন্যজন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

২২। সাজ-সজ্জায় স্বাভাবিকতা বজায় রাখবেন। উঠতি বয়সের ছেলেদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। সুতরাং এদের জন্য কখনোই উচিৎ নয় যে, এরা কড়া সুগন্ধি ব্যবহার

করবে, ব্যতিক্রমধর্মী আঁটোসাঁটো পোশাক পরবে, সাজ-সজ্জার ব্যাপারে কাফির ও মহিলাদের অনুসরণ করবে, মাথা আঁচড়ানো বা চুলের ভাঁজের প্রতি গুরুত্ব দিবে। এ জন্যই যে, তা অন্যের ফিৎনার কারণ।

২৩। উঠতি বয়সের ছেলেদের আরেকটি কর্তব্য হচ্ছে, তারা যে কারোর সঙ্গে মজা বা রঙ্গ-তামাশা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, অধিক কৌতুক মানুষের সম্মান বিনষ্ট করে দেয় এবং বোকাদেরকে তার ব্যাপারে অসভ্য আচরণ করতে সাহসী করে তোলে। তবে জায়িয কৌতুক একেবারেই নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তা নেক্কারদের সঙ্গেই হওয়া উচিৎ এবং তা ভদ্রতা ও মধ্যপন্থা বজায় রেখেই করতে হবে।

২৪। আত্ম সমালোচনা করতে শিখবেন। সময় থাকতে এখনই নিজের মনের সঙ্গে বুঝাপড়া করে নিবেন। চাই আপনি ছোটই হোন অথবা বড়। সেই কর্মটি আপনিই করে থাকুন অথবা তা আপনার সাথেই করা হোক না কেন।

আপনি যদি বড় বা বয়স্ক হয়ে থাকেন তা হলে আপনি নিজ মনকে এ বলে প্রশ্ন করবেন যে, এখনো আমি কিসের অপেক্ষায় রয়েছি? এ মারাত্মক কাজটি এখনো ছাড়ছিনা কেন? আমি কি সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার শাস্তির অপেক্ষা করছি? না, কি মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছি?

আর যদি আপনি অল্প বয়স্ক বা ছোট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি নিজ মনকে এ বলে প্রশ্ন করবেন যে, আমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমি অনেক দিন বাঁচবো। না কি যে কোনো সময় আমার মৃত্যু আসতে পারে অথচ আমি তখনো উক্ত গুনাহে লিপ্ত। আর যদি আমি বেঁচেই থাকি তা হলে এমন ঘৃণ্য কাজ নিয়েই কি বেঁচে থাকবো? আমার যৌবন কি এ কাজেই ব্যয় হতে থাকবে? আমি কি বিবাহ করবো না? তখন আমার স্ত্রী ও সন্তানের কী পরিণতি হবে? আমি কি কোনো এক দিন মানুষের কাছে লাঞ্ছিত হবো না? আমি কি কখনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হবো না? আমার কারণেই কি এ পবিত্র সমাজ ধ্বংসের পথে এগুচ্ছে না? আমি কি আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি ও অভিশাপের কারণ হচ্ছি না? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার সামনে আমার অবস্থান কী হবে?

২৫। উক্ত কর্মের পরিণতি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করবেন। কারণ কিছুক্ষণের মজার পরেই অপেক্ষা করছে দীর্ঘ আপসোস, লজ্জা, অপমান ও শাস্তি।

২৬। মনে রাখবেন এ জাতীয় মজার কোনো শেষ নেই। এ ব্যাধি হচ্ছে চুলকানির ন্যায়। যতই চুলকাবেন ততই চুলকানি বাড়বে। একটি শিকার মিললেই আরেকটি শিকারের ধান্দায় থাকতে হবে। কখনোই আপনার এ চাহিদা মিটবে না।

২৭। নেককারদের সাথে উঠাবসা করবেন ও বদ্কারদের থেকে বহু দূরে থাকবেন। কারণ নেক্কারদের সাথে উঠাবসা করলে অন্তর সজীব হয়, ব্রেইন আলোকিত হয়। আর বদ্কারদের থেকে দূরে থাকলে ধর্ম ও ইয্যত রক্ষা পায়।

২৮। বেশি বেশি রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করবেন, বার বার মৃত ব্যক্তির লাশ দেখতে যাবেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করবেন ও তার কবর যিয়ারত করবেন। তেমনিভাবে মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করবেন। কারণ তা যৌন উত্তেজনা প্রশমনের এক বিশেষ উপযোগী

২৯। কারো হুমকির সামনে কোনো ধরণের নতি স্বীকার করবেন না। বরং তা দ্রুত প্রশাসনকে জানাবেন। বিশেষ করে এ ব্যাপারটি ছোটদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য। কারণ এ কথাটি আপনি বিশেষভাবেই জেনে রাখবেন যে, এ জাতীয় ব্যক্তিরা যতই কাউকে ভয় দেখাক না কেন তারা এ ব্যাপারে উক্ত ব্যক্তির কঠিনতা বা সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা দেখলে অবশ্যই পিছপা হতে বাধ্য হবে।

কেউ এ ব্যাপারে নিজকে অক্ষম মনে করলে সে যেন দ্রুত তা নিজ পিতা, বড় ভাই, আস্থাভাজন শিক্ষক অথবা কোনো ধার্মিক ব্যক্তিকে জানায়, যাতে তাঁরা তাকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারেন।

৩০। বেশি বেশি সাধুতা ও তাওবাকারীদের কাহিনী সম্ভার পড়বেন। কারণ তাতে বহু ধরণের শিক্ষা, আত্মসম্মানের প্রতি উৎসাহ এবং বিশেষভাবে অসম্মানের প্রতি নিরুৎসাহ সৃষ্টি হবে।

৩১। বেশি বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ক্যাসেট সমূহ বিশেষ মনযোগ সহ শ্রবণ করবেন এবং গানের ক্যাসেট সমূহ শুনা থেকে একেবারেই বিরত থাকবেন।

৩২। সমাজের যে যে নেক্কার ব্যক্তিরা যুবকদের বিষয় সমূহ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন তাদের কারোর নিকট নিজের এ দুরবস্থা বিস্তারিত জানাবেন যাতে তাঁরা আপনাকে এ ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকটও আপনার এ অবস্থার পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেন যাতে তিনি আপনাকে উপযুক্ত চিকিৎসা দিতে পারেন অথবা উত্তেজনা প্রশমনের কোনো পদ্ধতি বাতলিয়ে দিতে পারেন।

প্রত্যেক বিবেকবান মানুষেরই এ কথা জানা উচিত যে,

শরীয়ত ও বিবেককে আশ্রয় করেই কোনো মানুষ তার সার্বিক কল্যাণ ও তার পরিপূর্ণতা এবং সকল অঘটন অথবা অন্ততপক্ষে তার কিয়দংশ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে থাকে।

সুতরাং বিবেকবানের সামনে যখন এমন কোনো ব্যাপার এসে পড়ে যার মধ্যে ভালো ও খারাপ উভয় দিকই রয়েছে তখন তার উপর দুটি কর্তব্য এসে পড়ে। তন্মধ্যে একটির সম্পর্ক জ্ঞানের সাথে এবং অপরটির সম্পর্ক কাজের সাথে। অর্থাৎ তাকে সর্বপ্রথম এ কথা জানতে হবে যে, উক্ত উভয় দিকের মধ্য থেকে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সে সেটিকেই প্রাধান্য দিবে। আর এ কথা সবারই জানা যে, কোনো মেয়ে বা শ্মশ্রুবিহীন ছেলের প্রেমে পড়ার মধ্যে দুনিয়াবী বা ধর্মীয় কোনো ফায়েদা নেই। বরং তাতে দ্বীন-দুনিয়ার অনেকগুলো গুরুতর ক্ষতি রয়েছে যার কিয়দংশ নিম্নরূপ :

(ক) আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসা ও তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে তাঁর কোনো সৃষ্টির ভালোবাসা ও তাঁর স্মরণে নিমগ্ন হওয়া। কারণ উভয়টি একত্রে সমভাবে কারোর হৃদয়ে অবস্থান করতে পারে না।

(খ) তার অন্তর আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্যকে ভালোবাসার দরুন নিদারণ কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হয়। কারণ প্রেমিক কখনো চিন্তামুক্ত হতে পারে না। বরং তাকে সর্বদা চিন্তাযুক্তই থাকতে হয়। প্রিয় বা প্রিয়াকে না পেয়ে থাকলে তাকে পাওয়ার চিন্তা এবং পেয়ে থাকলে তাকে আবার কখনো হারানোর চিন্তা।

(গ) প্রেমিকের অন্তর সর্বদা প্রিয় বা প্রিয়ার হাতেই থাকে। সে তাকে যেভাবেই চালাতে চায় সে সেভাবেই চলতে বাধ্য। তখন তার মধ্যে কোনো নিজস্ব ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে না। এর চাইতে আর বড় কোনো লাঞ্ছনা আছে কি?

(ঘ) দ্বীন-দুনিয়ার সকল কল্যাণ থেকে সে বঞ্চিত হয়। কারণ ধর্মীয় কল্যাণের জন্য তো আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অন্তরের উন্মুখতা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর তা প্রেমিকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অন্য দিকে দুনিয়াবী কল্যাণ তো দ্বীনি কল্যাণেরই অধীন। দ্বীনি কল্যাণ যার হাত ছাড়া হয় দুনিয়ার কল্যাণ সুস্থভাবে কখনো তার হস্তগত হতে পারে না।

(ঙ) দ্বীন-দুনিয়ার সকল বিপদ তার প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। কারণ মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারোর প্রেমে পড়ে যায় তখন তার অন্তর আল্লাহ্ বিমুখ হয়ে পড়ে। আর কারোর অন্তর আল্লাহ্ বিমুখ হলে শয়তান তার অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে। তখনই সকল বিপদাপদ তার দিকে দ্রুত ধাবমান হয়। কারণ শয়তান তো মানুষের আজন্ম শত্রু। আর কারোর কঠিন শত্রু যখন তার উপর কাবু করতে পারে তখন কি সে তার যথাসাধ্য ক্ষতি না করে এমনিতেই বসে থাকবে??

(চ) শয়তান যখন প্রেমিকের অন্তরে অবস্থান নিয়ে নেয় তখন সে উহাকে বিক্ষিপ্ত করে ছাড়ে এবং তাতে প্রচুর ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ঢেলে দেয়। কখনো কখনো এমন হয় যে, সে একান্ত বদ্ধ পাগলে পরিণত হয়। লাইলী প্রেমিক ঐতিহাসিক প্রেম পাগল মজনুর কথা তো আর কারোর অজানা নয়।

(ছ) এমনকী প্রেমিক কখনো কখনো প্রেমের দরুন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নিজের সকল অথবা কিছু বাহ্যেন্দ্রিয় হারিয়ে বসে। প্রত্যক্ষ তো এভাবে যে, প্রেমে পড়ে তো অনেকে নিজ শরীরই হারিয়ে বসে। ধীরে ধীরে তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তার কোনো ইন্দ্রিয়ই আর সুস্থভাবে বাহ্যিক কোনো কাজ সমাধা করতে পারে না।

একদা জনৈক যুবককে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট হাযির করা হলো। তখন তিনি আরাফাহ্ ময়দানে অবস্থানরত। যুবকটি একেবারেই দুর্বল হয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেলো। তখন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন : যুবকটির কী হলো? লোকেরা বললো : সে প্রেমে পড়েছে। এ কথা শুনেই তিনি তখন থেকে পুরো দিন আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রেম থেকে আশ্রয় কামনা করেন।

পরোক্ষ বাহ্যেন্দ্রিয় লোপ তো এভাবেই যে, প্রেমের দরুন তার অন্তর যখন বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তার বাহ্যেন্দ্রিয়গুলোও আর যথাযথ কাজ করে না। তখন তার চোখ আর তার প্রিয়ের কোনো দোষ দেখে না। কান আর প্রিয়কে নিয়ে কোনো গাল শুনতে বিরক্তি বোধ করে না। মুখ আর প্রিয়ের অযথা প্রশংসা করতে লজ্জা পায় না।

(জ) ইশকের পর্যায়ে যখন কেউ পৌঁছে যায় তখন তার প্রিয় পাত্রই তার চিন্তা-চেতনার একান্ত কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। তখন তার সকল শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহ অচল হয়ে পড়ে। তখন সে এমন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যার চিকিৎসা একেবারেই দুষ্কর।

এ ছাড়াও প্রেমের আরো অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন : কোনো প্রেমিক যখন লোক সমাজে তার প্রেমের কথা প্রকাশ করে দেয় তখন তার প্রিয়ের উপর সর্বপ্রথম বিশেষভাবে

যুলুম করা হয়। কারণ মানুষ তখন অনর্থকভাবে তাকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করতে থাকে। এমনকী তার ব্যাপারে কোনো মানুষ কোনো কথা বানিয়ে বললেও অন্যরা তা বিশ্বাস করতে একটুও দেরি করে না। এমনকী শুধু প্রিয়ের উপরই যুলুম সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা তার সমস্ত পরিবারবর্গের উপরও বর্তায়। কারণ এতে করে তাদেরও প্রচুর মানহানী হয়। অন্যদেরকেও মিথ্যারোপের গুনাহে নিমজ্জিত করা হয়। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য অন্যের সহযোগিতা নেওয়া হয় তখন তারাও গুনাহ্গার হয়। এ পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে তাদের অনেককে কখনো কখনো হত্যাও করা হয়। কত শত গভীর সম্পর্ক যে এ কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কত প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের অধিকার যে এ ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয় তার কোনো হিসাব নেই। আর যদি এ ক্ষেত্রে যাদুর সহযোগিতা নেওয়া হয় তা হলে একে তো শির্‌ক আবার এর উপর কুফরী। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়া মিলেই যায় তখন একে অপরকে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের উপর যুলুম করতে সহযোগিতা করে এবং অপরের সন্তুষ্টির জন্য কত মানুষের কত মাল যে হরণ করে তার কোনো হিসাব নেই। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়া অত্যন্ত চতুর হয়ে থাকে তখন সে প্রেমিককে আশা দিয়ে দিয়ে তার সকল সম্পদ বিনষ্ট করে দেয়। কখনো সে এমন কাণ্ড একই সঙ্গে অনেকের সাথেই করে বেড়ায়। তখন প্রেমিক রাগ করে কখনো তাকে হত্যা বা মারাত্মকভাবে আহত করে। আরও কত কী?

সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান এতো কিছু জানার পরও এ জাতীয় প্রেমে কখনো আবদ্ধ হতে পারে না।

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, আল্লাহ্ আমাদেরকে এ পাপসহ অন্য সকল পাপ থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন — আমীন।

وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

১৪শ পর্ব

বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী

মূল ঃ সাইয়্যেদ মাসউদুল হাসান
ভাষান্তর ঃ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নূর হুসাইন

নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর যে ব্যক্তি দ্বীনকে পরিবর্তন করে তার শাস্তি

৯২ - عَنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِىْ فَيُحَلَّئُوْنَ عَنْهُ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ : لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ اِنَّهُمْ اِرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرٰى.

৯২। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কতিপয় সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছে, নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আমার সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এদের মধ্য থেকে কিছু লোক আমার হাউজে কাওসারের নিকটে উপস্থিত হবে; কিন্তু তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব : হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার সাহাবী। তখন আল্লাহ্ বলবেন : আপনার মৃত্যুর পর এরা কী ঘটিয়েছে, এ সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা নেই — এরা আপনার মৃতুর পর দ্বীনের বিরোধিতা করেছে ও ধর্ম ত্যাগ করেছে (অর্থাৎ দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে) (বুখারী ৬৫৮৬)।

নোট : এ হাদীস থেকে সুন্নাহ্‌র তথা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কথা-কাজ, অনুমোদন ও গুণাবলীর ভূমিকার গুরুত্ব বুঝা যায়। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হওয়া নিশ্চিতভাবেই পথভ্রষ্টতা। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যেভাবে স্বলাত আদায় করেছেন প্রত্যেককে সেভাবেই স্বলাত আদায় করতে হবে। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যেভাবে দুআ করেছেন প্রত্যেককে সেভাবে দুআ করতে হবে। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু

আলাইহি অ সাল্লাম) যেভাবে বসেছেন প্রত্যেককে সেভাবে বসতে হবে। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যেভাবে খাবার খেয়েছেন প্রত্যেকেরই সেভাবে খাবার খাওয়া উচিৎ। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যেভাবে হেসেছেন প্রত্যেককেই সেভাবে হাসতে হবে।

নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ছিলেন হাতে কলমে শিক্ষা দানকারী শিক্ষক। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে কীভাবে পায়খানা করতে হবে তাও সব কিছুই শিক্ষা দিয়েছেন। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদের জন্য এমন পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (ধর্ম) রেখে গেছেন যা প্রত্যেকের দৈনন্দিন (প্রাত্যহিক) জীবনে প্রয়োজন পড়তে পারে। অতএব, আপনি যদি সুন্নাহ্ জানেন তবে আপনাকে তা আমল করতে হবে। আর যদি আপনি সুন্নাহ্ না জানেন তবে তা প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। নিজের দ্বীন (ধর্ম) জানার জন্য প্রশ্ন করা বাধ্যতামূলক।

٩٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ (رَبِّ اِنَّهُمَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ) وَ قَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ (اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ وَبَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ ـ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ ـ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْكَ، فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ فَسَاَلَهٗ فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ ـ وَ هُوَ اَعْلَمُ ـ فَقَالَ اللّٰهُ : يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَ لَا نَسُوْئُكَ.

৯৩। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে , নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা যে আয়াত নাজিল করেছেন তা তেলাওয়াত করলেন :

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ.

অর্থাৎ, হে প্রভু ! তারা (মূর্তি-পূজারীরা) বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত (সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ৩৬)।

ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর কথা :

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থাৎ, আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তো তারা আপনারই বান্দা; আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে তো আপনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ১১৮)।

তারপর দু' হাত তুলে বলেন : হে আল্লাহ্ ! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত ! এবং কান্না করলেন। তখন আল্লাহ্ বলেন : হে জিব্রাঈল তুমি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট যাও। গিয়ে জিজ্ঞাসা কর (যদিও তোমার প্রভু তা জানেন), কেন আপনি কাঁদছেন ? তখন জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর নিকট এসে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে এ বিষয়ে জানালেন যদিও তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) যখন আল্লাহ্কে সে বিষয়ে বললেন তখন আল্লাহ্ বলেন : হে জিব্রাঈল, মুহাম্মাদের নিকট (আবারো) যাও; গিয়ে বল : (আল্লাহ্ বলেন) আমি আপনাকে আপনার উম্মাতের ব্যাপারে খুশি করে দিব এবং আমি আপনার কোনো ক্ষতি করবো না (সহীহ্ হাদীস, মুসলিম ৫২০)।

উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম অর্থাৎ দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম

٩٤ ـ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ، وَاِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ) وَابْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى.

৯৪। আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : হে আদম সন্তান! যদি তুমি ভালো কাজ করো ও সৎকাজে ব্যয় করো তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর, আর যদি তুমি সৎ কাজে ব্যয় না করে কৃপণতা করো তবে তা তোমার জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু তুমি যদি গরিব হও তোমার জন্য কোনো অপরাধ নেই। আর (জেনে রাখ) উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাতের চেয়ে উত্তম (এটি হাসান হাদীস, ইমাম মুসলিম ১০৩৬)।

নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ

٩٥ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَلْتُ رَبِّىْ مَسْئَلَةً، وَدِدْتُ اَنِّىْ لَمْ اَسْاَلْهُ قُلْتُ : يَا رَبِّ كَانَتْ قَبْلِىْ رُسُلٌ مِنْهُمْ مَنْ سَخَّرْتَ لَهُمُ الرِّيَاحَ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحْىِ الْمَوْتٰى. قَالَ : اَلَمْ اَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوَيْتُكَ؟ اَلَمْ اَجِدْكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُكَ ؟ اَلَمْ اَجِدْكَ عَائِلًا فَاَغْنَيْتُكَ ؟ اَلَمْ اَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ؟ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ بَلٰى يَا رَبِّ.

৯৫। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : আমি আমার প্রভুকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছি - যদি আমি তা না করতাম (তবে কতই না ভাল হতো)! আমি বলেছিলাম : হে প্রভু! আমার পূর্বেকার নাবী-রসূলদের কারো জন্য বাতাসকে বশীভূত করা হয়েছিল, আবার কেউ মৃতকে জীবিত করত। তখন আল্লাহ্ বলেন : আমি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দিইনি? আমি কি আপনাকে হয়রান-পেরেশান অবস্থায় পেয়ে সুপথের সন্ধান দিইনি? আমি কি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়ে ধনী বানাইনি? আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিইনি? এবং আপনার (দুশ্চিন্তার) বোঝাকে দূর করে দিইনি? নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : আমি বললাম : হ্যাঁ হে প্রভু (এটা হাসান হাদীস, তাবারানি : ১২২৮৯, তার মু'জামে কবীরে বর্ণনা করেছেন)।

নোট : নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ফযীলত সম্বন্ধে এটাই যথেষ্ট যে, তিনি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত নাবী। তবুও তাঁকে এমন কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে যা অন্য কোনো নাবী রসূলকে দেওয়া হয়নি। যেমন হাশরের মাঠে শাফায়াত (সুপারিশ) করার অধিকার। তাঁর উম্মাতরাও শ্রেষ্ঠ উম্মাত এবং তারাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

প্রতিবেশীরা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি ভাল ছিল তবে আল্লাহ্ তাআলা মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন

٩٦ـ عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَشْهَدُ لَهٗ اَرْبَعَةُ اَهْلِ اَبْيَاتٍ مِنْ جِيْرَانِهِ الْاَدْنَيْنَ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيْهِ وَغَفَرْتُ لَهٗ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

৯৬। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন : যদি কোনো মুসলিম মারা যায় আর তার অতি নিকটতম চারজন প্রতিবেশি সাক্ষী দেয় যে, সে ভাল ছিল তবে আল্লাহ্ বলেন : তার ব্যাপারে তোমাদের ধারণাকে আমি কবুল করে নিলাম আর তার যে গুনাহ্ সম্বন্ধে তোমরা জাননা আমি তা ক্ষমা করে দিলাম (এ হাদীসটি অন্য হাদীসের কারণে হাসান, মুসনাদে আহমাদ ও মুসতাদরাকে হাকিমে ৩-২৬)।

নোট : এ পৃথিবীতে মানুষেরাই আল্লাহ্র সাক্ষী। অধিকাংশ মুসলিমরা যে বিষয়ে একমত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সঠিক।

٩٧ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ :

يَعْنِىْ اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى : لَا يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ لِىْ وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى : لِعَبْدِىْ (اَنْ يَقُوْلَ : اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنَ مَتّٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ) .

৯৭। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন : আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা (আলাইহিস্ সালাম) থেকে ভাল একথা বলা আমার কোনো বান্দার উচিৎ নয় (মুসলিম ২৭৭৬)।

নোট : কোনো ঈমানদার উম্মাতের একথা বলা শোভা পায়না যে সে ইউনুস (আলাইহিস্ সালাম) এর চেয়ে উত্তম। তবে অন্যান্য নাবীগণ একথা বলতে পারেন এবং তাদের মাঝে মুসাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শ্রেষ্ঠ।

প্লেগ-মহামারির কারণে মৃতের জন্য পুরস্কার

৯৮ – عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَأْتِى الشُّهَدَاءُ وَ الْمُتَوَفُّوْنَ بِالطَّاعُوْنِ فَيَقُوْلُ اَصْحَابُ الطَّاعُوْنِ : نَحْنُ شُهَدَاءُ فَيُقَالَ : انْظُرُوْا فَاِنْ كَانَتْ جِرَاحُهُمْ كَجِرَاحِ الشُّهَدَاءِ تَسِيْلُ دَمًا رِيْحَ الْمِسْكِ فَهُمْ شُهَدَاءُ فَيَجِدُوْنَهُمْ كَذٰلِكَ.

৯৮। উত্বা ইবনে আব্দুস্ সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : হাশরের ময়দানে শহীদগণ ও মহামারিতে মৃত ব্যক্তিগণ আসবে। তখন মহামারিতে মৃত ব্যক্তিগণ বলবে আমরা শহীদ। তখন তাদেরকে বলা হবে : দেখ, যদি তাদের ক্ষত শহীদের ক্ষতের মত হয় এবং তা থেকে মেশকের ঘ্রাণের মত ঘ্রাণযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় তবে তারা সত্যিই শহীদ। তখন তাদের রক্ত শুঁকে তা মেশকের ঘ্রাণযুক্ত পাওয়া যাবে (মুসনাদে আহমাদ ১৭৬৫১)।

নিকৃষ্ট স্থান

৯৯ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) : اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا اَدْرِىْ، فَلَمَّا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : يَا جِبْرِيْلُ اَىُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ : لَا اَدْرِى حَتّٰى اَسْاَلَ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ، فَانْطَلَقَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ سَاَلْتَنِىْ اَىُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ ؟ فَقُلْتُ : لَا اَدْرِىْ وَ اِنِّىْ سَاَلْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ اَىُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقَالَ : اَسْوَاقُهَا.

৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে যুবাইর ইবনে মুত্‌ইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন, এক লোক এসে নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করল : হে আল্লাহ্‌র রসূল! কোন স্থান সবচেয়ে নিকৃষ্ট। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : আমি জানিনা। যখন জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট এলেন, নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে (আলাইহিস্ সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন : হে জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কোন্ স্থান সবচেয়ে খারাপ? তখন জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বলেন : এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না এবং আমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। তারপর জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইলেন ততক্ষণ সেখানে (ঊর্ধ্ব জগতে) থাকলেন। তারপর এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কোন স্থান সবচেয়ে খারাপ? আমি বলেছিলাম, আমি তা জানিনা। আমি আমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'কোন্ স্থান সব থেকে নিকৃষ্ট?' আল্লাহ্ বলেছেন, তা হলো বাজার (বাজার হলো সবচেয়ে খারাপ জায়গা) (অন্য হাদীসের কারণে এটি হাসান হাদীস মুসনাদ আহমাদ

ঃ ১৬৭৪৪ ইমাম হাকিম (রঃ) তাঁর মুসতাদরাকে ও ইমাম তাবারানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন) *(শুআইব আরনাউত ও অন্যান্যগণ হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। তবে এ মর্মে সহীহ্ হাদীস রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কথা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যার অর্থ হল, "আল্লাহ্র নিকট সর্বপ্রিয় স্থান হল মাসজিদসমূহ এবং সর্বাধিক ক্রোধের স্থান হল বাজারসমূহ, মুসলিম : ৬৭১ — সম্পাদনা পরিষদ)*।

নোট : এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, বাজার হলো সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান। কেননা, সেখানেই মানুষেরা পার্থিব আমোদ-প্রমোদ ও ধন-সম্পদের পেছনে লাগে। সেখানে মানুষের গীবত ও বুহতান করা হয় খুব বেশি। মানুষ শুধু টাকা-পয়সা ও আমোদ-প্রমোদই চায়। ইসলামে তার বৈধতা হারাম যা-ই হোক না কেন তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু প্রকৃত মুসলিমের উচিৎ সর্বদা মহান কুরআন ও নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বিধান অনুসারে চলা।

হাউযে কাওসার

১০০ – عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا اِذَا اَغْفٰى اِغْفَائَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهٗ مُبْتَسِمًا، فَقُلْنَا : مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ :اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَاَ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (اِنَّآ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ) ثُمَّ قَالَ : اَتَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ ؟ فَقُلْنَا : اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ : فَاِنَّهٗ نَهْرٌ وَ عَدَنِيْهِ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰنِيَتُهٗ عَدَدُ النُّجُوْمِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاَقُوْلُ : رَبِّ اِنَّهٗ مِنْ اُمَّتِىْ فَيَقُوْلُ : مَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَتْ بَعْدَكَ.

১০০। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদের মাঝে একটু ঘুমিয়ে নিলেন। তারপর ঘুম থেকে মুচকি হাসি হাসতে হাসতে উঠলেন। তাই আমরা বললাম : হে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আপনি হাসছেন কেন? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : এইমাত্র আমার নিকট একটি সূরা নাযিল (অবতীর্ণ) হলো। তারপর তিনি তেলাওয়াত করলেন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ○ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○

অর্থাৎ, পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি — হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার নামক ঝর্ণা দান করেছি। সুতরাং আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে স্বলাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই লেজ কাটা নির্বংশ (কুরআন সূরা কাওসার)।

এরপর নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : তোমরা কি জান কাওসার কী? আমরা বললাম : আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : তা একটি নদী, আমাকে আমার প্রভু এটা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এটা অনেক কল্যাণকর একটি কূপ ও ঝর্ণা বা ফোয়ারা, এর পাড়ে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতগণ আসবে; এর পেয়ালার সংখ্যা হবে তারকারাজির সংখ্যার মত অসংখ্য। কিছু লোককে এর নিকট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব : হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার উম্মাত। আল্লাহ্ তখন বলবেন : আপনি জানেন না যে, তারা আপনার ইন্তেকালের পর কী ধরণের ধর্মদ্রোহীতা বা বিদ্‌আত (দ্বীন বিরোধী কার্যকলাপ) করেছে (সহীহ্ হাদীস; মুসলিম ৯২১, আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

নোট : নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হওয়ার বিপদ এ হাদীস থেকে বুঝা যায়। আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হতে হলে প্রত্যেক নেক আমলেরই দুটি শর্ত পূরণ হতে হবে। তার একটি হলো এই যে, তা আল্লাহ্র সাথে কোনোরূপ শরীক সাব্যস্ত না করে শুধুমাত্র আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) জন্যই হতে হবে। আর দ্বিতীয় হলো এই যে, তা নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাহ তথা হাদীস মোতাবেক সম্পাদিত হতে হবে।

১ম পর্ব

অযূতে ঘাড় মাসাহ্ করা সুন্নাত নাকি বিদ'আত

আহমাদুল্লাহ্

প্রথম অধ্যায়

মাযহাবী ভাইদের রচিত স্বলাত সম্পর্কিত গ্রন্থ সমূহে লেখা হয়েছে যে, অযূতে ঘাড় মাসাহ্ করা সুন্নাত। যেমন মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব সম্পাদিত 'নবীজির নামায' (পৃঃ ১১৪) গ্রন্থে ঘাড় মাসাহ্‌কে সুন্নাত আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এর পক্ষে একটি মুরসাল (যা যঈফ) দলীলও পেশ করা হয়েছে।

আশরাফ আলী থানবী লিখেছেন, ''অতঃপর দুই হাতের আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা গর্দান মাসহে করিবে। গলা মাসহে করিবে না, ইহা নিষেধ এবং দূষণীয়'' (মহিউদ্দীন খানের 'আরজ' সম্বলিত মোকাম্মাল মোদাল্লাল বেহেশতী জেওর ১/২৩, হামিদিয়া লাইব্রেরী, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ই)।

ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ্ ঘাড় 'মাসাহ্ করাকে সুন্নাত বলেছেন এবং গলা মাসাহ্‌কে দুষণীয় বলেছেন ' মর্মে কোনো স্পষ্ট দলীল আমরা অবহিত হতে পারিনি। এ বিষয়ে বেহেশতী জেওরেও কোনো উদ্ধৃতি নেই, যেখানে ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ্ হ'তে এটি প্রমাণ করা যায়। ''হাতের তালু দিয়ে ঘাড় মাসাহ্ করা যাবে না'' বা ''আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা মাসাহ্ করতে হবে'' মর্মে কোনো ফতওয়া ইমাম আবূ হানীফার পক্ষ হ'তে বিদ্যমান আছে বলে আমরা অবগত নই।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মারফূ' বর্ণনাসমূহ[১]

নিম্নে ঘাড় মাসাহ্ করার ব্যাপারে পেশকৃত কতিপয় দলীলের তাহক্বীক্ব সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল —

দলীল — ১ :

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلٰى عُنُقِهِ، وُقِىَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি অযূ করবে এবং তার দু'হাত দ্বারা স্বীয় ঘাড় মাসাহ্ করবে তাকে কিয়ামতের দিনে বেড়ী হ'তে মুক্ত রাখা হবে (আত্-তালখীছুল হাবীর হাঃ ৯৮)।

পর্যালোচনা : এটি প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন —

قُلْتُ : بَيْنَ ابْنِ فَارِسٍ، وَ فُلَيْحٍ مَفَازَةٌ، فَيُنْظَرُ فِيْهَا.

আমি বলছি, ইবনে ফারেস এবং ফুলায়হ-এর মাঝে সমস্যার স্থলটি রয়েছে। অতএব এতে লক্ষ্য করতে হবে (ঐ)।

অর্থাৎ উভয়ের মাঝে কোন্ রাবী লুকায়িত আছেন তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আল্লামা শাওকানী রাহেমাহুল্লাহ্‌র মতে, যদি উভয়ের মাঝে হুসায়েন বিন উলওয়ান থাকেন, তবে তিনি সমালোচিত রাবী (নায়লুল আওত্বার হা/১৯৮-এর আলোচনা দ্রঃ)। যেমন —

১। ইবনু জাওযী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন —

اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيْثَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيْثِهِ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ.

আবূ হাতেম বলেন, হুসায়েন বিন উলওয়ান হাদীস জাল করতেন। তাঁর হাদীস লেখা যাবে না। আহমাদ এবং ইয়াহ্ইয়া তাঁকে মিথ্যুক বলেছেন (আত্ তাহক্বীক্ব ফী মাসাইলিল খিলাফ হা/৩০৬-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/২৬২)।

তিনি আরো বলেন —

يروى عن هِشَام بن عُرْوَة وَ الْأَعْمَش، قَالَ يحيى كَذَّاب وَ ضَعفه عَلىّ جدا وَ قَالَ النَّسَائِىّ وَ أَبُو حَاتِم الرَّازِىّ وَ الدَّارُقُطْنِىّ مَتْرُوْك الحَدِيْث وَ قَالَ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِىّ كَذَّاب خبيث لَا يكْتب حَدِيثه.

তিনি হিশাম বিন উরওয়া এবং আ'মাশ হ'তে বর্ণনা করেন। ইয়াহ্ইয়া বলেন, ''তিনি মহা মিথ্যুক''। আলী অত্যন্ত দুর্বল

১। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত উক্তি, কাজ এবং মৌন সমর্থনকে মারফূ' হাদীস (মারফূ' রেওয়াত বা বর্ণনা) বলা হয় —লেখক।

বলেছেন। নাসাঈ এবং আবূ হাতেম, দারাকুৎনী বলেছেন, ''তিনি মাতরূকুল হাদীস''। আবুল ফাৎহ আযদী বলেছেন, ''তিনি মহা মিথ্যুক, খবীস। তার হাদীস লেখা যাবে না'' (আয্ যু'আফাউ অল মাতরূকূন, রাবী নং ৯৮৯)।

(২) হায়সামী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন — الْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ، وَ هُوَ ضَعِيْفٌ হুসায়েন বিন উলওয়ান হলেন যঈফ (মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৬৮৫২, ১০/৯০)।

(৩) ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন — الْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ وَ هُوَمَتْرُوك হুসায়েন বিন উলওয়ান হ'লেন মাতরূক বা পরিত্যাজ্য (আদ্ দিরায়াহ্ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া হা/৬৮, ১/৮৫)।

(৪) সাখাবী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন— فالحسين متهم بالكذب আর হুসায়েন মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত (আল্ মাক্বাসিদুল হাসানা হা/১৬২-এর আলোচনা দ্রঃ, পৃঃ ১৫০)।

(৫) 'আল ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ্' গ্রন্থে আছে —

الْحُسَيْنُ بن علوان يضع الحديث

হুসায়েন বিন উলওয়ান হাদীস বানাতেন (হা/৪৬)।

(৬) سمعت يحيى يقول الحسين بن علوان كذاب ইমাম দূরী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, আমি শুনেছি, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন (তারীখে ইবনু মাঈন, দূরীর বর্ণনা, রাবী নং ৪৮৯৩)।

(৭) ইবনে আবী হাতেম রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন —

سمعت أبى يقول : هو واه ضعيف متروك الحديث.

আমি আমার পিতাকে (ইমাম আবূ হাতেমকে) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তিনি (হুসায়েন বিন উলওয়ান) অত্যন্ত দুর্বল, মাতরূকুল হাদীস (ইবনু আবী হাতেম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, রাবী নং ২৭৭)।

(৮) ইবনে আদী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন - يضع الحديث তিনি হাদীস বানাতেন (আল কামিল ফী যুআফা'ইর রিজাল, রাবী নং ৪৮৯)। তার সম্পর্কে সমালোচনামূলক বক্তব্য লিপিবন্ধ করে তিনি বলেন—

وَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ اَحَادِيثُ كَثِيْرَةٌ وَ عَامَّتُهَا مَوْضُوعَةٌ، وَ هو فى عداد من يضع الحَدِيْثَ.

আর হুসায়েন বিন উলওয়ানের অসংখ্য হাদীস রয়েছে এবং সেগুলির অধিকাংশই বানোয়াট। যাঁরা হাদীস জাল করতেন তাঁদের মাঝে তাকে গণ্য করা হয় (ঐ, ৩/২৩৩)।

(৯) আবূ নু'আইম রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন —

الْحُسَيْنِ بن علوان شيخ كُوفِى حدث عَن هِشَام بن عُرْوَة بمناكير و موضوعات لَا شَيْء.

হুসায়েন বিন উলওয়ান হ'লেন কুফর শায়খ। তিনি হিশাম বিন উরওয়া হ'তে মুনকার বর্ণনাসমূহ এবং বানোয়াট রেওয়াতসমূহ বর্ণনা করতেন। তিনি কিছুই নন (আয্ যু'আফা, রাবী নং ৪৯)।

(১০) হাফেয যাহাবী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, مَتْرُوك هَالك তিনি পরিত্যাক্ত, ধ্বংস প্রাপ্ত (আল্ মুগনী ফীয যুআফা, রাবী নং ১৫৪৭)।

আলোচনার সারাংশ হ'ল, যদি হুসায়েন এই সনদে থেকে থাকেন তবে এটি বানোয়াট। নতুবা রাবী মাজহূল থাকার কারণে এটি যঈফ।

দলীল - ২ :

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دَاوُد ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خِرْزَادَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عُنُقَهُ وَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالْأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আনাস বিন সীরীন ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হ'তে বর্ণনা করেন, ইবনে উমার যখন অযূ করতেন তখন তাঁর ঘাড় মাসাহ্ করতেন এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে অযূ করবে এবং তার ঘাড় মাসাহ করবে ক্বিয়ামতের দিনে তাকে শিকল বাঁধা হবে না'' (আত্ তালখীসুল হাবীর হা/৯৮, ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ্ এটি আবূ নু'আইম রাহেমাহুল্লাহ্র উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন)।

পর্যালোচনা : এটি প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা তথা যঈফ। যেমন - এই সনদের অন্যতম রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর আনসারী সমালোচিত।

(১) তাঁকে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রাহেমাহুল্লাহ্ যঈফ বলেছেন (তারীখে ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, দূরীর বর্ণনা, রাবী নং ৩৩২৮)।

(২) ইমাম শাওকানী স্বয়ং লিখেছেন وَ الْأَنْصَارِىُّ هَذَا وَاهٍ এবং এই আনসারী অত্যন্ত যঈফ (নায়লুল আওত্বার হা/১৯৮)।

(৩) ইমাম হাকেম রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন, وَ هُوَ عَزِيْزُ الْحَدِيْثِ جِدًّا তিনি অতিমাত্রায় আযীয হাদীস বর্ণনা করতেন (আল্ মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন হা/৬৬৫)।

(৪) ইবনে হাজার বলেছেন, قلت : لكنه ضعيف আমি বলি, কিন্তু তিনি যঈফ (ইতহাফুল মাহরাহ হা/১৯৮১১)।

(৫) আলবানী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, متفق على تضعيفه তার যঈফ হওয়ার উপরে ঐক্যমত আছে (সিল্‌সিলাহ্ যঈফা হা/৬৯)। অন্যত্র তিনি বলেছেন —

قلت : و هذا اسناد ضعيف، ورجاله ثقات ؛ غير الأنصارى هذا ؛ و كنيته أبو سهل؛ فانه ضعيف.

আমি বলি, এবং এ সনদটি যঈফ। এর রাবীগণ সিক্বাহ্ এই আনসারী ব্যতীত। তার উপনাম হ'ল আবূ সাহল। নিশ্চয়ই তিনি যঈফ (যঈফা হা/৫১৫১)।

(৬) 'আল-ইলাল' গ্রন্থে আছে —

مُحَمَّد بن عَمْرو الْأَنْصَارِىّ كَانَ يكون بِالْبَصْرِة و عبادان وَ كَانَ يحيى بن سعيد يُضعفهُ جدا.

মুহাম্মাদ বিন আমর আনসারী বসরায় এবং আবাদানে থাকতেন। ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রাহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে অত্যন্ত যঈফ বলতেন (আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল লি-আহমাদ, আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদের বর্ণনা, রাবী নং ৩২৪৮; উক্বায়লী, আয-যু'আফা, রাবী নং ১৬৬৮)।

(৭) 'আল মুক্বতারাব ফী বায়ানিল মুযত্বারাব' গ্রন্থে আছে,

محمد بن عمرو الأنصارى الواقفى أبو سهل البصرى مشهور بكنيته و اختلف فى اسم جده ضعيف من السابعة.

মুহাম্মাদ বিন আমর আনসারী আল-ওয়াক্বিফী আবূ সাহল-তাঁর উপনাম দ্বারা প্রসিদ্ধ। তাঁর দাদার নাম নিয়ে মতানৈক্য আছে। তিনি সপ্তম স্তরের যঈফ রাবী (রাবী নং ১৩৩)।

(৮) দূরী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন -

سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول أَبُو سهل مُحَمَّد بن عَمْرو الْأَنْصَارِىّ ضَعِيف.

আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আবূ সাহল মুহাম্মাদ বিন আমর যঈফ (তারীখে ইয়াহইয়া বিন মাঈন, দূরীর বর্ণনা রাবী নং ৩৩২৮)।

(৯) ইমাম আবূ দাউদ রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন,

سألك أبا دَاوُد عَن مُحَمَّد بُن عمرٍو الْأَنْصَارِى قَالَ : كَانَ يَحْيَى ابن سَعِيْد يضعفه.

আমি আবূ দাউদকে মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বললেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ তাকে যঈফ বলতেন (সুওয়ালাতু আবূ উবায়েদ আল-আজুর্রী, রাবী নং ৫৬১)।

(১০) ইবনে হিব্বান রাহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে 'আস্-সিক্বাত' -এ উল্লেখ করেছেন (আস্ সিক্বাত, রাবী নং ৪৪৩৮)। কিন্তু তিনি (ইবনে হিব্বান) তাঁরে 'আল-মাজরূহীন' তথা সমালোচিত রাবীদের গ্রন্থেও উল্লেখ করে তাঁর সম্পর্কে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেছেন (আল-মাজরূহীন, রাবী নং ৯৮২)।

(১১) ইবনে আদী রাহেমাহুল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেছেন (আল্-কামিল ফী যুআফা'ইর রিজাল, রাবী নং ১৬৯৪)।

(১২) ইবনে শাহীন রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন, وأبو سهل - محمد بن عمرو الأنصارى ضعيف আবূ সাহল হ'লেন মুহাম্মাদ বিন আমর আনসারী। তিনি যঈফ (তারীখে আসমাইয

যুআফা ওয়াল কায্যাবীন, রাবী নং ৫৫৫)।

(১৩) ইবনে হাজার তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেছেন (তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬২৩)।

মোট কথা, মুহাম্মাদ বিন আমর একজন যঈফ রাবী। তাঁর যঈফ হওয়া সম্পর্কে জমহুর ইমামদের মাঝে ঐক্যমত রয়েছে। সুতরাং আলবানীর দাবী একেবারেই সঠিক। আর ইবনে হিব্বানের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়াও তাঁর বক্তব্য জমহুর মুহাদ্দিসদের বিরোধী হয়েছে। যা সর্বদাই প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

দলীল - ৩ :

مـن تـوضـأ و مسح يديه على عنقه أمن من الغل يوم القيامة. أبو نعيم عن ابن عمر.

যে অযূ করবে এবং তার দু'হাত দ্বারা ঘাড় মাসাহ্ করবে, সে কিয়ামতের দিনে বেড়ী (পরানো) থেকে নিরাপদে থাকবে (কানযুল উম্মাল হা/২৬১৪২)।

পর্যালোচনা : এই বর্ণনাটি খুবই যঈফ। আল-উৎলুওয়ানী এর সনদকে যঈফ বলেছেন (কাশফুল খফা হা/২৩০০)। 'উনুক'-এর অর্থ হ'ল 'গলা'। আল্লামা ইবনুল মানযূর রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন -

عـنق : الْعُنُقُ وَ الْعُنُقُ : وُصْلة مَا بَيْنَ الرَّأْسِ وَ الْجَسَدِ، يُذَكَّرُ وَ يُؤَنَّثُ.

উনুক হ'ল শরীর এবং মাথার মাঝখানে বন্ধনস্বরূপ বা সংযোগস্থল (লিসানুল আরব ১/২৭১)। গলাকে 'ঘাড় ' অর্থ নেওয়া ভুল। গলায় মাসাহ্ করা হানাফীদের নিকটে দোষণীয় হারাম। তাই তাদের কেউ কেউ এই বর্ণনাটির 'উনুক' শব্দটির অর্থ 'গলা' না করে 'ঘাড়' বলে চালিয়ে দেন (দেখুন : আল্লামা মুহাম্মাদ দাউদ আরশাদ, হাদীস আওর আহ্লে তাক্বলীদ বি-জওয়াবে হাদীস আওর আহ্লে হাদীস ১/২৩৮)। এর সনদেও পূর্বোল্লিখিত 'মুহাম্মাদ বিন আমর আনসারী' আছেন। এতদ্ভিন্ন এর সনদে আরো ত্রুটিযুক্ত রাবী আছেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি খুবই দুর্বল। যা আমল এবং দলীলের উপযুক্ত নয়।

৩য় পর্ব

اَلْهَدِيَّةُ الذَّهَبِيَّةُ مِنَ الدُّرَرِ الْبَهِيَّةِ

উজ্জ্বল মোতিসমূহের সোনালী উপহার

মূল (উর্দূ) শাইখ হাফেয যুবায়র আলী যাঈ

সংকলন ও অনুবাদ ঃ আবূ হাবীবাহ্ সানাবিলী

(৫) আল্লাহ্ আরশে সমুন্নত

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে, বিতরের কুনূতে নিম্নোক্ত দুআ সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত :

اَلـلّٰهُـمَّ اهْـدِنِـىُ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِىُ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَـوَلَّنِىُ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِىُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَ قِنِىُ شَرَّ مَـا قَـضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىُ وَ لَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَـنْ وَّالَيْـتَ وَ لَا يَـعِـزُّ مَـنْ عَـادَيْتَ تَبَـارَكْـتَ رَبَّنَـا وَ تَعَالَيْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে হিদায়াত ক'রে তাদের দলভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছো এবং আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছো এবং আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান ক'রে আমাকে তাদের দলভুক্ত কর, যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছো। আর তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছো, তাতে বরকত দাও এবং আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছো, তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই ফায়সালা করে থাকো এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো, সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দ বাসো, সে সম্মানিত হয় না। তুমি বরকতময় হে আমাদের রব এবং তুমি সুমহান এবং উচ্চতার অধিকারী (মুসনাদ আহমাদ ১/১৯৯ হা: ১৭১৮ সূত্র সহীহ্, অল-মাউসূয়াতুল্ হাদীসীয়্যাহ ৩/২৪৫, হাদীসটিকে ইবনু খুযায়মাহ হা: ১০৯৫, ইবনুল জারূদ হা: ২৭২, সহীহ্ বলেছেন এবং আবূ দাউদ

অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন হা: ১৪২৫ এবং তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করার পর হাসান বলেছেন হা: ৪৬৪, এছাড়াও হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, নাসিরুদ্দীন আলবানী ও হাফেয যুবায়র আলী যাঈ সুনানে নাসায়ী হা: ১৭৪৫, হুসনে সালীম আসাদ, সুনানুদ্ দারিমী হা: ১৫৯৩, মুসনাদ আবী ইয়ালা হা: ৬৭৮৬, শুয়াইব আরনাউত্ব মুসনাদ আহমাদ হা: ১৭১৮)।

সতর্কীকরণ :ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক্ব 'তাদলীস' থেকে মুক্ত ছিলেন। দেখুন আমার বই 'আল্ ফাতহুল মুবীন ফী তাহক্বীকে তাবক্বাতিল মুদাল্লিসীন' (২/৬৬) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র।

'অতায়ালায়তা' (এবং তুমি সুমহান ও উচ্চতার অধিকারী) শব্দের বিশ্লেষণ সৌদী আরবের সুখ্যাতি সম্পন্ন ফকীহ্ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু স্বালেহ ইবনে উসায়মীন (রাহেমাহুল্লাহ্) লিখেছেন : নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীসের শব্দ 'অতায়ালায়তা'-র অর্থ : তায়ালা (উঁচু হওয়া, উচ্চ হওয়া, বড় হওয়া, উর্দ্ধে হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া এবং মহান হওয়া)।

উচ্চ হওয়ায় জোরদানের জন্য শেষে যোগ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলার উঁচু হওয়া দুই প্রকারের (১) عُلُوُ الذَّاتِ সত্তাগত উচ্চতা (২) عُلُوُ الصِّفَةِ গুণগত উচ্চতা। সত্তাগত উচ্চতার অর্থ হল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং সমস্ত জিনিসের উপরে অধিষ্ঠিত। আর গুণগত উচ্চতার অর্থ হল এই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা উচ্চতার সমস্ত গুণে গুণান্বিত।

প্রথমত: (সত্তাগত উচ্চতা) কে জাহমীদের একটা অংশ 'হোলূলিয়্যাহ' এবং তাদের অনুসারীরা অস্বীকার করেছে। আর বলেছে : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সত্তার সাথে সর্বত্রই বিরাজমান।[১]

আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী অস্বীকারকারী সীমালংঘনকারী দল মুয়াত্তেলাহ্ও এ বলে (তাঁর গুণাবলীকে) অস্বীকার করে দিয়েছে যে, ''আল্লাহ্ নিশ্চয়ই না দুনিয়ার উপরে আছেন আর না নীচে, ডানে আছেন আর না বামে আছেন, আগে আছেন আর না পিছে আছেন, মিলিত আছেন আর না পৃথক আছেন।'' অর্থাৎ : (তাদের নিকট আল্লাহ্ একটা অস্তিত্বহীন বস্তু যার কোনো সত্তা নেই) সুতরাং সম্রাট মাহমূদ ইবনু সুবুক্তগীণ রাহেমাহুল্লাহ্ সেই ব্যক্তির খণ্ড করে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলাকে উপরোল্লিখিত শব্দাবলীতে বিশেষিত মনে করত যে, ''এতো অস্তিত্বহীন বস্তুর গুণ'' বাদশাহ মাহমূদ সত্যই বলেছেন যে, এটা বিদ্যমান ও অস্তিত্বহীন বস্তুর গুণ।

আহ্লে সুন্নাত অল্ জামাআত (আহলে হাদীস) এর বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা স্বীয় সত্তার সাথেই সকল বস্তুর উপর সমুন্নত। তাঁরা এ বিশ্বাসের প্রমাণে পাঁচ প্রকারের দলীল পেশ করেছেন : (১) কুরআন, (২) সুন্নাত, (৩) ইজমা, (৪) জ্ঞান-বুদ্ধি, (৫) স্বভাব-প্রকৃতি।

কুরআন ঃ আল্লাহ্ সমুন্নত হওয়ার প্রমাণে, কুরআনে সমস্ত প্রকারের দলীল বিদ্যমান। কয়েকটি আয়াত :

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى

অর্থ : তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো (সূরা আলা ১)।

এখানে রয়েছে عُلُوٌّ শব্দ যার অর্থ হয় উচ্চতা, উচ্চ মর্যাদা, মহত্ব এবং আরো কিছু আয়াতে আছে —

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ

অর্থ ঃ তিনি নিজের দাসদের উপর পরাক্রমশালী (সূরা আনআম ৬/১৮) (অর্থাৎ সমস্ত মস্তক তাঁর সামনে অবনত। বড় বড় দুর্ধর্ষ তাঁর সামনে অক্ষম। তিনি সব কিছুর উপর বিজয়ী এবং সারা সৃষ্টি তাঁর অনুগত। আহসানুল বায়ান ১/৪১৪)। এখানে রয়েছে فَوْقِيَّتُ শব্দ অর্থ উচ্চতা এবং কিছু আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার দিকে কিছু জিনিসের আরোহণ করা এবং উপরে উঠার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন - تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ অর্থ : ফিরিশতা এবং রূহ তাঁর দিকে উর্ধ্বগামী হয় (সূরা মায়ারিজ ৭০/৪)। এই রকমই আল্লাহর ফারমান اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ

১। মুফতী মাহ্মূদুল হাসান গাংগোহী দেওবন্দী লিখেছেন : 'আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান' (মালফূযাত ফাক্বীহুল উম্মাহ ২/১৪)।

উল্লিখিত মুফতী তাঁর এ অসত্য আক্বীদার ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে লিখেছেন : ইবনে জাওযীকে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, আল্লাহ্ কোথায় আছেন ? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান (প্রগুক্ত ১৪ পৃঃ)। হাফেয ইবনুল জাওযী, জাহমীদের একটি দল মুলতাযিমাহ্ সম্পর্কে, এই অসত্য ও মিথ্যা রটনার সম্পূর্ণ উল্টা কথা লিখেছেন ''আর মুলতাযিমাহ্ তো আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলাকে সর্বত্র বিরাজমান'' বলে দিয়েছে (তালবীসে ইবলীস ৩০ পৃঃ)।

الطَّيِّبُ অর্থ : সৎ বাক্য তাঁর দিকে আরোহণ করে (সূরা ফাতির ৩৫/১০)। কিছু আয়াতে আল্লাহ্র কাছ থেকে বস্তুসমূহের নেমে আসা বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন : يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ অর্থ : তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন (সূরা আস্ সাজদাহ্ ৩২/৫) (অর্থাৎ যেখানে আল্লাহ্র আরশ ও 'লাওহে মাহফূয' আছে। আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে নির্দেশাবলী অবতীর্ণ করেন; অর্থাৎ বিশ্ব পরিচালনা করেন এবং পৃথিবীতে তাঁর হুকুম বাস্তবায়িত হয়। যেমন জীবন-মৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা, চাওয়া-পাওয়া, ধনবত্তা-দারিদ্রতা, যুদ্ধ-সন্ধি, সম্মান-অসম্মান ইত্যাদি। আল্লাহ্ তাআলা আরশের উপর থেকে তাঁর লিখিত ভাগ্য অনুযায়ী এসব কিছুর তদ্বীর ও ব্যবস্থাপনা ক'রে থাকেন (তাফসীর আহসানুল বায়ান ৩/৩৮, টীকা ১৬৫)।

সুন্নাত : আল্লাহ্ তাআলার সমুন্নত হওয়ার আক্বীদাহ্ হাদীসের তিন প্রকারে : (১) কাওল (কথা-বার্তা), (২) ফেল (কাজ-কর্ম), (৩) তাক্বরীর (মৌন সম্মতি) বর্ণিত হয়েছে।

কাওল : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সাজদাহ সমূহে - سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (উচ্চারণ : সুবহানা রব্বীয়্যাল্ আলা।) অর্থ : আমি আমার মহান প্রভুর প্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করি, পাঠ করতেন (মুসলিম হা/১৮৫০)।

ফেল : আরাফার দিন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) খুতবা দেওয়ার সময় (সাহাবায়ে কিরাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি দ্বীন পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সাহাবাগণ উত্তরে বলেন, জি হ্যাঁ! নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো, তিনি শাহাদাতের আঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠালেন এবং তা নিচে করে মানুষের দিকে ইশারা করলেন (মুসলিম হা/২৯৫০)। উক্ত হাদীসে কর্ম দ্বারা আল্লাহ্র উচ্চতা প্রমাণ করলেন।

তাক্বরীর : নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একটি দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্ কোথায় আছে? দাসীটি বলল : আকাশের উপর। তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দাসীটির প্রশংসা করলেন (মুসলিম হা/১১৯৯)। এটা তাক্বরীরী হাদীস অর্থাৎ তাঁর মৌন সমর্থন, যা আল্লাহ্ তাআলার আরশে সমুন্নত হওয়ার দলীল।

ইজমা : আমি ইজমার ব্যাপারে বলব যে, সমস্ত সালাফে স্বালেহীন, সাহাবা, তাবেঈন এবং মুজতাহিদ উলামাগণের এই আক্বীদার উপর ইজমা আছে। ইজমার প্রমাণ এ থেকে পাওয়া যায় যে, তাঁদের কোনো একজন থেকেও আল্লাহ্র সমুন্নত হওয়ার দলীলসমূহকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে, রূপক অর্থের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া প্রমাণিত নয়। আমার পুস্তকে ইতিপূর্বে একথা অতিবাহিত হয়েছে যে, ইজমাকে জানার জন্য এটি খুব ভাল পদ্ধতি। যদি আপনাকে কেউ প্রশ্ন করে কে বলছে যে, তাঁরা (সালাফে স্বালেহীন) ইজমা করেছেন? কে বলছে যে, আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্ তাআলাকে তাঁর সত্তার সাথে সমুন্নত মনে করতেন? এবং কে বলেছে যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আক্বীদা পোষণ করেছেন? এবং কে বলেছে যে, উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ কথাই বলেছেন? এবং কে বলেছে যে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ আক্বীদা বর্ণনা করেছেন? এর উত্তর হচ্ছে যে, (সাহাবা ও তাবেঈনগণ) থেকে সমুন্নত হওয়ার দলীল সমূহের বিপরীতে কোনো কিছুই প্রমাণিত নয়। যা একথার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, তাঁরা এই সমস্ত আয়াত এবং হাদীসমসূহের সত্যায়ণ করে তাকে প্রকাশ্য অর্থের উপরই স্থাপন করেছেন।

আক্বল্ (জ্ঞান, বুদ্ধি, বোধশক্তি) : আক্বলের ব্যাপারে বলব যে, উচ্চ হওয়া পূর্ণতার গুণ আর তার বিপরীত (উচ্চ না হওয়া) অসম্পূর্ণতার গুণ। আর আল্লাহ্ তাআলা অসম্পূর্ণতার গুণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এবং রাজত্বের পরিপূর্ণতা হচ্ছে উচ্চতা। আমরা পৃথিবীতেও দেখছি যে, সম্পদের জন্য উচ্চ আসন (রাজাসন) বিছানো হচ্ছে, যার উপর তাঁরা বসছেন।

ফিত্রাত্ (স্বভাব, প্রকৃতি) : স্বভাবের বিষয়ে যতই বর্ণনা করা হোক না কেন তা কম। এক বৃদ্ধা মহিলা, যে শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তেও জানত না আর হাদীসেরও সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না, সে সালাফ (পূর্বপুরুষ) দের পুস্তকাদি যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যার ফাতাওয়ার বই ও পড়েনি অথচ সে জানে যে, আল্লাহ্ আকাশের উপর আছেন। সকল মুসলিম যখন আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে তখন নিজের দুই হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করে। কোনো মুসলিম যমীনের দিকে হাত করে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى হে আল্লাহ্! আমায় ক্ষমা করে দাও, কখনই বলে না। সুতরাং হামদানী, আবুল্ মুয়ালী আল্ জুয়াইনীর বিপক্ষে মানুষের স্বভাব থেকেই দলীল পেশ করেছিলেন। আবুল্ মুয়ালীর বক্তব্য ছিল

''আল্লাহ্ ছিল তা ছাড়া কোনো জিনিস ছিল না, আর সেই আল্লাহ্ যেখানে ছিল সেখানেই আছে।'' এভাবে সে আল্লাহ্র আরশে সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করত। আবূ জাফার আল্ হামদানী (রাহেমাহুল্লাহ্) তাকে বলেন : হে শাইখ! আরশের বর্ণনা ছাড়ুন কারণ আল্লাহ্র আরশে সমুন্নত হওয়া সাময়ী (শ্রবণ ভিত্তিক) দলীল (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস) থেকে প্রমাণিত। যদি আল্লাহ্ আমাদের সংবাদ না দিতেন তো আমরা কখনো তার সত্যায়ণ করতাম না। এ স্বভাব সম্পর্কে কী বলবেন? অভিজ্ঞ ব্যক্তি (বুদ্ধিমান, আল্লাহ্কে জানে এমন ব্যক্তি) যখন يَا اَللهُ হে আল্লাহ্! বলে তখন তার অন্তরে আল্লাহ্র উচ্চতারই কল্পনা জাগে? আবুল মুয়ালী (তখন) নিজের হাত দ্বারা নিজের মাথায় আঘাত করতে করতে বলেন : এতো আমাকে হতবুদ্ধি ও দিশেহারা করে দিল, আমাকে দিশেহারা করে দিল " (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/৪৭৭)। এই স্বভাব গত দলীলের বিপরীতে (ইমামুল হারামায়ন আবুল্ মুয়ালী) কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। এমনকী প্রাণীকুলও এই স্বভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন, সুলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এর ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন ইস্তিসক্বা (বৃষ্টি প্রার্থনার) জন্য বের হলেন, দেখলেন একটি পিপীলিকা চিৎ হয়ে শুয়ে নিজের পাগুলোকে আকাশের দিকে উঠিয়ে দিয়ে বলছে : ''হে আল্লাহ্! আমরাও তোমার সৃষ্টিকুলের অন্তর্ভুক্ত। আমরা তোমরা দেওয়া জীবিকা থেকে অমুখাপেক্ষী নয়''। সুলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) বলেন, ''লোক সকল! ফিরে চল তোমরা ব্যতীত অন্যদের (পিপীলিকার) দুআ গৃহীত হয়ে গেছে'' (সুনানুদ্ দারাকুত্বনী ২/৬৬, হাকেম ফিল্ মুস্তাদরক ১/৩২৫, ৩৬৬ হাকেম সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর সমর্থ করেছেন)।

এই পিপড়ের দুআয় আল্লাহ্ তাআলা বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। এই পিপীলিকাকে কে বলেছিল যে, আল্লাহ্ আকাশে আছেন? সে ঐ স্বভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার উপর আল্লাহ্ তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন, সেই স্বভাবই তাকে বলেছে যে, আল্লাহ্ আকাশে আছেন।

অতি আশ্চর্যের যে, এই প্রকাশ্য দলীলসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্বেও অন্তর্দৃষ্টিহীন কিছু লোক আল্লাহ্র সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করে বলে, ''সত্তার সাথে আল্লাহ্র সমুন্নত হওয়া সম্ভব নয়।'' যদি কোনো লোক বলে, ''নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সত্তার সাথে সমস্ত বস্তুর উপর সমুন্নত।'' তো তারা এ ব্যক্তিকে কাফের বলছে। কারণ তাদের ধারণা অনুযায়ী সে আল্লাহ্র সীমা বর্ণনা করে দিল।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে তাঁর (সত্তার সাথে) উপরে মনে করে সে কি আল্লাহ্র সীমিত ও সীমাবন্ধ হওয়ার আক্বীদাহ্ পোষণ করে? কখনোই নয়, আল্লাহ্ উপরে আছেন কেউ তাঁকে বেষ্টন করেনি। আল্লাহ্কে সীমাবন্ধ মন্তব্যকারী ব্যক্তি, যে দাবী করছে যে, ''আল্লাহ্ সব জায়গায় বিরাজমান। যদি তুমি মসজিদে থাকো তবে আল্লাহ্ও মসজিদে থাকে। আর যদি তুমি বাজারে থাকো তবে আল্লাহ্ও বাজারে থাকে।'' আহলে সুন্নাত (আহ্লে হাদীস) বলছে, ''আল্লাহ আসমানের উপরে আছেন, সৃষ্টিকুলের কেউ তাঁর ঘেরাও করতে সক্ষম নয়।'' ইহা সর্বোচ্চ পবিত্রকরণ (আল্লাহ্কে সব দোষ থেকে মুক্ত ও পবিত্র মনে করা)। উচ্চতার গুণের দলীল। আল্লাহ্ বলেন, وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى আর আল্লাহ্র জন্য রয়েছে উৎকৃষ্টতম গুণ (সূরা নাহাল ১৬/৬০)।

অর্থাৎ তাঁর প্রত্যেক গুণ সৃষ্টির গুণের তুলনায় মহত্তর। যেমন তাঁর জ্ঞান অপরিসীম, তাঁর শক্তি অতুলনীয়, তাঁর দানশীলতা দৃষ্টান্তবিহীন, অনুরূপ সকল গুণাবলী। অথবা এর অর্থ হল, তিনি শক্তিশালী, সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ইত্যাদি (তিনি সর্বগুণনিধি)।

অর্থাৎ : পূর্ণতার গুণ আল্লাহ্র জন্যই আর ইহা শ্রবণভিত্তিক দলীল। আর জ্ঞানের ব্যাপারে, তো জ্ঞানের চূড়ান্ত মীমাংসা হল মহান প্রতিপালকের গুণাবলী হবে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ (আস্ শারহুল্ মুমতি আলা যাদিল্, মুস্তানক্বি, মুদ্রণ : দারু ইবনিল জাওযী ১৪২৩ হিজরী ৩/৫৩২-৫৩৬)।

যাকাতের কতিপয় বিষয়

আতাউর রহমান সালাফী

যাকাত কী ? যাকাতের আরবী শব্দ হল زَكَاةٌ।

আভিধানিক অর্থ ঃ যাকাত-এর আভিধানিক অর্থ হল বৃদ্ধিকরণ ও পবিত্রকরণ। মহান আল্লাহ্ বলেন —

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا.

অর্থ ঃ হে মুহাম্মাদ তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ্ (যাকাত) গ্রহণ করো, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবে ও তাদের সম্পদে বৃদ্ধিকরণ করবে (৯/১০৩)। কুরআন ও হাদীসের অধিকাংশ জায়গায় যাকাত শব্দ পবিত্রকরণের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ৯১/৯, ৮৭/১৪, ৫৩/৩২ আয়াতগুলি দ্রষ্টব্য।

পারিভাষিক অর্থ ঃ সম্পদের এমন এক অংশ যা আল্লাহ্র বিধানানুযায়ী আদায় করা হয়।

যাকাতকে যাকাত এজন্যই বলা হয় যে, এর দ্বারা মাল বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদ ও সম্পদশালী পবিত্র হয়। সম্পদ ও সম্পদশালীর পবিত্র হওয়া স্পষ্ট। কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া সর্বক্ষেত্রে বাহ্যত দৃশ্যমান না হলেও বরকত বৃদ্ধি পায়। যে মালে যাকাত আদায় করা হয় না সে মালে বরকত থাকে না। বরকত হল আল্লাহ্ প্রদত্ত এমন কল্যাণ যার প্রভাবে মালের বৃদ্ধি দৃশ্যমান না হলেও মানুষের চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। মানুষের দৃষ্টিতে ধনী বলে বিবেচিত না হলেও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ধনী। এমন ব্যক্তির গাড়ি, বাড়ি ও সঞ্চয়ের বহর না থাকলেও মানসিক পরিতৃপ্তির বহর ঈর্ষণীয়।

আমাদের সম্পদে যাকাত আদায় না করার ফলে বরকত না থাকার কারণেই বাহ্যত মালের আধিক্য থাকলেও চাহিদা তার চাইতেও অধিক। সর্বদায় আরো সম্পদের সন্ধানে অর্জিত সম্পদটুকুও ভোগ করার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায়। এমনি করতে করতে হঠাৎ একদিন এসে হাযির যমদূত।

যাকাত হল ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। এ বিষয়ে এ রকম সংক্ষিপ্ত লিখনীতে সকল বিষয় বুঝানো সম্ভব নয়। এ যাকাতের বিধান হল শর্ত সাপেক্ষে ব্যক্তিগত ফরয। এ বিষয়ে বর্ণনা সম্বলিত বহু আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কয়েকটি হল —

(১) আল্লাহ্ বলেন, তোমরা স্বলাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত প্রদান করো এবং রসূলের অনুসরণ করো, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে (২৪/৫৬)।

(২) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) বলেন, ইসলামকে পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপন করা হয়েছে — (ক) আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল একথার সাক্ষ্য দান, (খ) স্বলাত প্রতিষ্ঠা, (গ) যাকাত প্রদান, (ঘ) হজ্ব সম্পাদন ও (ঙ) রমাযানের সিয়ামব্রত পালন (বুখারী ৮, মুসলিম ১৯)।

(৩) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মাআয বিন জাবালকে ইয়ামানে প্রেরণ কালীন বলেন, ''তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সম্পদে সাদাকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন, তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রেদের মাঝে বিতরণ করা হবে'' (বুখারী ১৩৯৫, মুসলিম ৩১)।

(৪) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যতক্ষণ না 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' এর সাক্ষ্য প্রদান, স্বলাত প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত প্রদান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে লড়াই করব। যখন তারা একাজ করবে, তখন তারা তাদের জান ও মাল বাঁচিয়ে নিবে ইসলামের হক ব্যতীত (অর্থাৎ স্বলাত সম্পাদন ও যাকাত প্রদান করেও হত্যার প্রতিশোধ ও অন্যান্য কারণে হাদ বা শাস্তি কার্যকর হতে পারে) এদের হিসাব আল্লাহ্র দায়িত্বে অর্পিত হবে (বুখারী ২৪)।

যাকাত কীসে কীসে ও কী পরিমাণে ফরয ঃ

পশু, উৎপন্ন শস্য, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং গচ্ছিত টাকা ও ব্যবসার মাল— এ চার ধরণের মালে চার রকম পরিমাণে যাকাত ফরয। সংক্ষিপ্তকরণের জন্য শুধু স্বর্ণ-রৌপ্য এবং গচ্ছিত টাকা ও ব্যবসার মালের যাকাত বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

১। স্বর্ণ ও রৌপ্য (সোনা-চাঁদী) ঃ

কী পরিমাণে যাকাত ফরয হয় ঃ সোনা কমপক্ষে কুড়ি দিনার এবং চাঁদী কমপক্ষে দু শ দিরহাম থাকলে যাকাত ফরয হয়। এর কম পরিমাণে যাকাত ফরয হয় না। এ পরিমাণ সোনা বা চাঁদী অর্জন হওয়ার পর এক বছর পূর্ণ হতে হবে তবেই যাকাত ফরয হবে (আবূ দাউদ ১৫৭৩, চারণভূমিতে চরে পালিত পশুর যাকাত অধ্যায়)।

দীনার হল স্বর্ণ মুদ্রা এবং দিরহাম হল রৌপ্য মুদ্রা। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময় যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার

প্রচলন ছিল সে হিসাবেই নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ বিধান দিয়েছিলেন।

দীনার ও দিরহামের আধুনিক ওজন বিষয়ে পর্যালোচনা *ঃ এ দীনার ও দিরহামের সঠিক পরিমাপ জানতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা আমার অর্জন হয়েছে তা হল এই যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে দেশ ও এলাকার ভিন্নতায় দীনার ও দিরহামের মুদ্রারও সামান্য পরিবর্তন ঘটে। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময়ের দীনার ও দিরহামের সম্পূর্ণ নিখুঁত ওজন পাওয়া হয়তো সম্ভব নয়। আর এ কারণেই এ দুয়ের ওজন অন্য এককে রূপান্তরিত করতে গিয়ে আলোচকগণের মধ্যে বেশ হেরফের লক্ষ্য করা যায়। এ দীনার ও দিরহামকে ভারতীয় ওজন পদ্ধতিতে লিখতে গিয়ে শাইখ উবাইদুল্লাহ্ রহমানী মুবারাকপুরী লিখেছেন, কুড়ি দীনার = সাড়ে সাত ভরি এবং দুশ দিরহাম = সাড়ে বাহান্ন ভরি (মিরআতুল মফাতীহ্)। এ ভরিকে গ্রামে রূপান্তরিত করলে হবে — যেহেতু ১ ভরি ১১.৬৬৪ গ্রাম, তাই সোনা ৭.৫ ভরি x ১১.৬৬৪ = ৮৭.৪৮ গ্রাম এবং চাঁদী ৫২.৫ ভরি x ১১.৬৬৪ = ৬১২.৩৬ গ্রাম। অথচ জানিনা কী হিসাবে শাইখ সাফীউর রহমান মুবারাকপুরী ও হাফিয ইমরান আইয়ুব লাহোরী এ দুটি ওজনকে ১০৫ গ্রাম এবং ৭৩৫ গ্রাম লিখেছেন (ইত্তিহাফুল কেরাম ও ফিকহুল হাদীস)। এ দীনার ও দিরহামের সঠিক ওজন সন্ধান করতে পাড়ি দিই বর্তমান অবগতির অন্যতম মাধ্যম ইন্টারনেটের জগতে। তথায় www.islamicmint.com/dinar-dirham.html সাইটে মিলে সন্ধান। দীনারের বিষয়ে যা দেখতে পাই তা হল — The Islamic Dinar is a specific weight of 22K gold (917) equivalent to 4.25 grams [২২ ক্যারেট সোনার (৯১৭) ইসলামিক দীনারের নির্দিষ্ট ওজন হল ৪.২৫ গ্রামের সমপরিমাণ]। ২৪ ক্যারেট সোনা হল সম্পূর্ণ খাঁটি।*

২২ ক্যারেটের অর্থ হচ্ছে x ১০০ = ৯১.৬৬% খাঁটি। এ ওজন অনুযায়ী কুড়ি দীনারের ওজন হবে ২০x ৪.২৫ = ৮৫ গ্রাম অর্থাৎ = ৭.২৮৭ ভরি।

এ ওজন ৯১.৬৬% খাঁটি সোনার ভিত্তিতে বলে একে ১০০% খাঁটি করে ওজন বের করা ঠিক হবে না। কেননা শুধুমাত্র ওজন নেওয়া উদ্দেশ্যে, সোনার পরিমাণ নয়। এখানে দীনারের ওজনে শুধু সোনার ওজন বোঝানো হয়নি। খাদ সহ দীনারের ওজন বুঝানো হয়েছে। যদি দীনারের এ ওজন শুধু সোনার ওজন হত তাহলে অবশ্যই ১০০% খাঁটি করার প্রয়োজন পড়তো। তবে প্রকাশ থাকে যে, আমাদের কাছে থাকা সোনা-চাঁদীর যাকাত ফরযের প্রথম মাত্রা নির্ণয়ের জন্য খাদ বাদ দিয়েই হিসাবে গণ্য হবে।

আর দিরহামের বিষয়ে যা দেখতে পাই তা হল, The Islamic Dirham is a specific weight of pure Silver is equivalent to 2.975 grams. *(খাঁটি চাঁদীর ইসলামী দিরহামের নির্দিষ্ট ওজন হল ২.৯৭৫ গ্রাম)। কাজেই ২০০ দিরহামের ওজন হবে ২০০ x ২.৯৭৫ = ৫৯৫ গ্রাম অর্থাৎ (((/((((((= ৫১ ভরি।*

উক্ত সোনা-চাঁদীর দুই ওজনকে গ্রামের বিষয়ে মুহাম্মাদ বিন সলিহ উসাইমীন কোনো বিশ্লেষণ ছাড়া বলেন, কুড়ি দীনার স্বর্ণ মুদ্রার ওজন হল ৮৫ গ্রাম এবং দু শ দিরহাম রৌপ্য মুদ্রার ওজন হল ৫৯৫ গ্রাম (মাজমূ ফাতাওয়া উসাইমীন)।

ইবনু বায ২০ দীনার স্বর্ণ মুদ্রার ওজন ৯২ গ্রাম লিখেছেন। তবে তিনি বলেন, ৮৫ গ্রাম হল যাকাত ফরয হওয়ায় সর্ব নিম্ন মাত্রা (মাজমূ মাফাতাওয়া ইবনু বায)। দু শ দিরহাম চাঁদীর ওজন গ্রামের এককে রূপান্তরিত মাত্রা ইবনু বাযের ফাতাওয়া গ্রন্থে আমি দেখতে পাইনি।

যাকাত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনাকারী ডঃ ইউসুফ কারযাভী শুধু দিরহাম ও দীনার নিয়ে যা আলোচনা করেছেন তা আমার এ প্রবন্ধ ছাপিয়ে যাবে। তিনি সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের পর গ্রামের এককে সোনা ৮৫ গ্রাম এবং চাঁদী ৫৯৫ গ্রাম স্থির করেছেন (ফিকহুয্ যাকাত, প্রথম খণ্ড ২৮৩ পৃঃ, মাকতাবা অহবা, কায়রো)।

দীনার ও দিরহামের গ্রহণযোগ্য আধুনিক ওজন ঃ এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য ও সঠিক কথা হল, আধুনিক ওজন অনুযায়ী কমপক্ষে সোনা যদি ৮৫ গ্রাম অর্থাৎ ৭.২৯ ভরি এবং চাঁদি যদি ৫৯৫ গ্রাম অর্থাৎ ৫১ ভরি থাকে তবে যাকাত ফরয হবে। এর কম সোনা বা চাঁদীতে যাকাত ফরয হবে না। দুই বস্তুতে যাকাত তখনই লাগবে যখন দুটিই কমপক্ষে ফরয হওয়ার মাত্রা পরিমাণ থাকবে। একটি যদি ফরযের মাত্রা পরিমাণ হয় আর অপরটি না হয় তবে যার পরিমাণ ফরয হওয়ার মাত্রা সমান থাকবে কেবল তাতেই যাকাত ফরয হবে অপরটিতে নয়।

অলংকারের যাকাত ঃ অলংকার সোনার হোক বা চাঁদীর, যদি ফরয হওয়ার মাত্রা পরিমাণ থাকে তবে তাতে যাকাত আদায় করতে হবে।

ব্যবহারের অলংকার, ব্যবহার বহির্ভূত অলংকার বা অলংকার ছাড়া সোনা-চাঁদী, একই ধাতুর সকল প্রকার বস্তুকে সম্মিলিতভাবে হিসাব করতে হবে। একই ধাতুর ব্যবহারের অলংকার, ব্যবহার বহির্ভূত অলংকার ও অলংকার নয় এভাবে আলাদা আলাদা হিসাব হবে না।

যাকাতের হার ঃ সোনা ও চাঁদীর যাকাতের হার হল ২.৫%। যাকাত ফরয হওয়ার মাত্রায় পৌঁছালে যতটুকু সোনা বা চাঁদী থাকবে সম্পূর্ণ সোনা-চাঁদীর ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

(২) গচ্ছিত টাকা ও ব্যবসার মাল ঃ

গচ্ছিত টাকা এবং ব্যবসার মালেও যাকাত ফরয। আল্লাহ্ বলেন, ''তুমি তাদের সম্পদ হতে সাদাকাহ্ (যাকাত) গ্রহণ করো, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করে দেবে" (৯/১০৩)। ''হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপার্জন থেকে এবং আমি যা ভূমি থেকে উৎপাদন করেছি তা থেকে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট মাল খরচ করো (যাকাতের মাধ্যমে বা সাধারণ দানের মাধ্যমে)" (২/২৬৭)।

প্রথম আয়াতে সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণের এবং দ্বিতীয় আয়াতে উপার্জন হতে খরচের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গচ্ছিত টাকা ও ব্যবসার মাল মানুষের সম্পদ ও উপার্জিত বস্তু; কাজেই এ দুই সম্পদেও যাকাত আদায় করতে হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময়ে আদান প্রদানের বিনিময় মুদ্রা হিসাবে দিরহাম ও দীনারের প্রচলন ছিল। তাই দিরহাম ও দীনারের বিষয়ে যাকাতের বিবরণ হাদীসে এসেছে।

বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময়ে না থাকায় সউদী মুদ্রা রিয়াল, ভারতীয় মুদ্রা টাকা বা অন্য দেশীয় মুদ্রা ডলার ইত্যাদি বিষয়ে যাকাতের বিবরণ হাদীসে পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন দেশের প্রচলিত মুদ্রাই হল সময় ও রাজনৈতিক আবর্তনের ফলে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময়ে প্রচলিত মুদ্রা দিরহাম বা দীনারের বিকল্প রূপ। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রা ও ব্যবসা পণ্যের যাকাতের নিসাবের জন্য এসবের দিরহাম বা দীনারের মূল্য নির্ণয় করতে হবে।

সোনা-চাঁদীর (দীনার-দিরহাম) যাকাতের বিবরণে আলোচিত হয়েছে যে, ৮৫ গ্রাম (৭.২৯ ভরি) সোনা বা ৫৯৫ গ্রাম (৫১ ভরি) চাঁদী থাকলে যাকাত লাগবে। সুতরাং কারো নিকট যদি উক্ত পরিমাণ সোনা বা চাঁদীর সমমূল্য ভারতীয় টাকা বা সমমূল্যের ব্যবসা পণ্য থাকে তবে তাকে যাকাত দিতে হবে। যে সময়ে যাকাত বের করা হবে সে সময়ের স্ট্যান্ডার্ড রেট কার্যকর হবে। এ বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড রেট সংবাদ পত্রে পেয়ে যাবেন। আজ ২৫.০৫.১৭ ইন্টারনেট থেকে নেওয়া কোলকাতার রেট অনুযায়ী খাঁটি চাঁদীর রেট হল প্রতি গ্রাম ৪০.২০ টাকা এবং খাঁটি সোনার রেট হল প্রতি গ্রাম ৩০৭০.৯০ টাকা। এ রেট অনুযায়ী ৫১ ভরি (৫৯৫ গ্রাম) চাঁদীর মূল্য হবে ২৩,৯১৯ টাকা এবং ৭.২৯ ভরি (৮৫ গ্রাম) সোনার মূল্য হবে ২,৬১,০২৬.৫ টাকা। কারো নিকট যদি কমপক্ষে চাঁদীর মূল্য হিসাবে ২৩,৯০০ টাকা বা সোনার মূল্য হিসাবে ২,৬১,০০০ টাকা থাকে তবে তার উপর যাকাত ফরয হবে। এই শর্তে যে, উক্ত পরিমাণ টাকা আয়ত্ব হওয়ার পর কমপক্ষে ঐ পরিমাণেই এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল উভয় মূল্যে বিস্তর ফারাক। টাকা ও অন্য সম্পদের ক্ষেত্রে কোন্ মূল্য কার্যকর হবে সোনা, না চাঁদীর? এক্ষেত্রে নিয়ম হল যে, 'সন্দেহমুক্ত ও অধিক কল্যাণ যাতে রয়েছে তা কার্যকর করা হবে। চাঁদীর মূল্য ধরে যাকাত বের করলে যাকাত দাতা যেমন বিপদগ্রস্ত হওয়ার সংশয় মুক্ত হচ্ছেন তেমনি এ ক্ষেত্রে ইসলামের জন্য অধিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কাজেই চাঁদীর মূল্য ধরে যাকাত বের করতে হবে।

যদি কোনো ব্যবসায়ীর মূলধন ২৩,৯০০ টাকা হয় বা তার সমপরিমাণ মূল্যের বিক্রয়যোগ্য পণ্য থাকে এবং এক বছরের মধ্যে কখনো উক্ত মূলধন বা বিক্রয়যোগ্য পণ্য হ্রাস না পায়, তাহলে যেদিন বছর পূর্ণ হবে, সেদিন মজুত সমস্ত সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবে।

অনুরূপ ব্যবসা বর্হিভূত গচ্ছিত টাকার ক্ষেত্রে কারোও নিকট যদি কমপক্ষে ২৩,৯০০ টাকা এক বছর সঞ্চিত থাকে তবে যত টাকার বছর পূর্তি হয়েছে তত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাতের হার ঃ ব্যবসার মাল ও গচ্ছিত অর্থে সোনা-চাঁদীর হার কার্যকর হবে অর্থাৎ ২.৫%।

সোনা-চাঁদী, গোরু-ছাগল ও শস্যের ব্যবসা ঃ কোনো ব্যক্তি যদি সোনা-চাঁদীর বা সোনা-চাঁদীর অলংকারের ব্যবসা করেন তবে যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ধাতুকে যাকাত ফরয হওয়ার মাত্রা পৌঁছানো শর্ত নয়। উভয় ধাতুর মধ্যে কোনো একটি বা দুটির মূল্য মিলিয়ে যদি যাকাত ফরয হওয়ার নিম্ন মূল্যের মাত্রাটির সমান হয় তবে, উভয় প্রকার ধাতুতে, ধাতু ও অলংকারের উপর যুক্তভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। যে ধাতু যাকাত ফরয হওয়ার মাত্রায় পৌঁছায়নি সেটি বাদ যাবে না। এ জন্যই যে, হাদীসে বর্ণিত যাকাত ফরয হওয়ার মাত্রা সর্বক্ষেত্রেই ব্যবসার জন্য নয় বরং সঞ্চয় করে রাখা ধাতু ও ব্যবহৃত অলংকারের জন্য ইঙ্গিত বহন

করে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি গোরু বা ছাগলের ব্যবসা করেন তবে তার উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ত্রিশটি গোরু বা চল্লিশটি ছাগল বা তার মূল্য থাকা শর্ত নয়। কেননা এমন ব্যক্তি ঐ পশু পালন করেন না। বরং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময়ের প্রচলিত মুদ্রার বিকল্প রূপ টাকার বিনিময়ে গোর-ছাগলের ব্যবসা করেন। এমন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হবে যদি ৫৯৫ গ্রাম চাঁদীর মূল্যের সমান টাকা পূর্ণ এক বছর থাকে।

অনুরূপ কোনো ব্যক্তি যদি শস্যের ব্যবসা করেন তবে উৎপন্ন শস্যের যাকাত ফরয হওয়ার মাত্রা পরিমাণ হওয়া শর্ত নয়। কেননা শস্যের বিষয়ে যে মাত্রা তা যাকাত দাতার জমিতে উৎপন্ন হতে হবে। এক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি মুদ্রার বিনিময়ে শস্যের ব্যবসা করছেন। কাজেই এমন ব্যক্তির নিকট যদি ৫৯৫ গ্রাম চাঁদীর সমমূল্যের শস্য পূর্ণ এক বছর থাকে, তবে যাকাত ফরয হবে।

যাকাত আদায়ের সময় ঃ পশু, সোনা-চাঁদী, ব্যবসার মাল ও গচ্ছিত টাকার যাকাত আদায়ের জন্য কোনো মাস নির্দিষ্ট নেই। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মেয়াদ চান্দ্র হিসাব অনুযায়ী এক বছর পূর্ণ যখন হবে তখনই যাকাত আদায় করতে হবে। রমাযান মাস যাকাতের মাস মর্মে কোনো প্রমাণ আমাদের জানা নেই।

যাকাতের হিসাব ঃ যাকাতের মাল সোনা বা চাঁদী হোক কিংবা টাকা, যাকাত বের করার জন্য হিসাব জানা কোনো লোকের শরণাপন্ন হতে হবে না। নিজেই যাকাত বের করুন। সোনা বা চাঁদীর ভরিকে ক্যালকুলেটার দিয়ে ৪০ দ্বারা ভাগ করুন। ভরির হিসাবে যাকাত বের হয়ে যাবে। অথবা ভরিকে ১১.৬৬৪ দ্বারা গুণ করে গ্রাম করে নিয়ে ৪০ দ্বারা ভাগ করুন। গ্রামের হিসাবে যাকাত বের হয়ে যাবে। টাকা হলে টাকার পরিমাণকে ৪০ দিয়ে ভাগ করুন। ভাগফলই যাকাতের পরিমাণ।

উদাহরণ স্বরূপ ৩টি সমাধান — (ক) ১০ ভরি সোনার যাকাত কত হবে? সমাধান ঃ ১০÷৪০ = ০.২৫ ভরি, বা ১০x ১১.৬৬৪ = ১১৬.৬৪ ÷ ৪০ = ২.৯১৬ গ্রাম। অর্থাৎ চার আনা বা ২.৯১৬ গ্রাম যাকাত লাগবে। (খ) ৬০ ভরি চাঁদীর যাকাত কত হবে? সমাধান, ৬০÷ ৪০ =১.৫ (দেড়) ভরি (যাকাত), বা ৬০ x ১১.৬৬৪ = ৬৯৯.৮৪ ÷ ৪০ = ১৭.৪৯৬ গ্রাম (যাকাত)। (গ) ৫০,৫৫০ টাকার যাকাত কত? সমাধান, ৫০,৫৫০ ÷৪০ =১২৬৩.৭৫ টাকা (এক হাজার দু শ তেষট্টি টাকা পঁচাত্তর পয়সা)।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে যাকাতের বিধান জানার ও তদানুযায়ী আমাল করে পরকালীন শাস্তি থেকে বাঁচার তাওফীক দাও— আমীন।

ব্যবসায়ীদের যাকাতের হিসাব

প্রথম অংশ

১।	নগদ ক্যাশ	১,০০,০০০.০০
২।	ব্যাংক ব্যালান্স	২,০০,০০০.০০
৩।	বিক্রয়যোগ্য মালের ক্রয় মূল্য	৭,০০,০০০.০০
৪।	পাওনা টাকার পরিমাণ (পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এমন পাওনা)	১,০০,০০০.০০
		মোট : ১১,০০,০০০.০০

দ্বিতীয় অংশ

১।	মহাজন দেনা	২,০০,০০০.০০
২।	ব্যক্তিগত দেনা	৫০,০০০.০০
		মোট : ২,৫০,০০০.০০

হিসাব অনুযায়ী মোট সম্পদ হল প্রথম অংশ – দ্বিতীয় অংশ = (১১,০০,০০০.০০ – ২,৫০,০০০.০০) = ৮,৫০,০০০.০০/- অতএব যাকাত লাগবে ৮৫০০০০.০০ x ২.৫% = ২১২৫০/-

চাকুরীজীবিদের যাকাতের হিসাব

প্রথম অংশ

১।	নগদ অর্থ	১,০০,০০০.০০
২।	ব্যাংক ব্যালান্স	৭,০০,০০০.০০
৩।	পাওনা টাকা	৫০,০০০.০০
৪।	পি.এফ. (সুদ ব্যতীত) জমানো টাকা	৩,০০,০০০.০০
		মোট : ১১,৫০,০০০.০০

দ্বিতীয় অংশ

১।	দেনা	২,০০,০০০.০০

অতএব মোট সম্পদ হল প্রথম অংশ – দ্বিতীয় অংশ = (১১, ৫০,০০০.০০ – ২,০০,০০০.০০) = ৯,৫০,০০০/-
যাকাত লাগবে ৯,৫০,০০০ x ২.৫% = ২৩,৭৫০/-

বিঃ দ্রঃ — হিসাবের দিনও যদি কারো কোনো উৎস থেকে কোনো টাকা ক্যাশে আসে, তাহলে উক্ত টাকারও যাকাত দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র নিসাবের উপরই এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী সমস্ত টাকার উপর নয়।

L.I.C. বা অন্যান্য সঞ্চয় প্রথম অংশে যোগ করতে হবে। Loan দ্বিতীয় অংশে যোগ করতে হবে। কিন্তু L.I.C.ও Loan কারীদের এ রকম সুদী কারবার থেকে তাওবা করতে হবে। না হলে যাকাত দিয়েও সুদের গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।

কিস্তির বকেয়া বা ধার থাকলে দ্বিতীয় অংশে যোগ হবে, তবে এ রকম কারবার পরিহার করা জরুরী — সম্পাদনা পরিষদ।

সিয়াম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

জবাব ঃ শায়খ সলিহ আল উসাইমীন হাফিযাহুল্লাহ্

১। প্রশ্ন ঃ রমাযান মাসে দিনের বেলায় কোনো রোযাদার আতর জাতীয় সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে কি?

উত্তর ঃ রমাযান মাসে দিনের বেলায় আতর ব্যবহার ও সুগন্ধি নেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই ; কিন্তু ধুপধূনা ও আগরবাতি ব্যবহরা করা যাবে না; কেননা এতে অস্তিত্বশীল প্রতিক্রিয়া রয়েছে যা পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়। আর এ ধোঁয়া-ই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল।

২। প্রশ্ন ঃ কোনো রোযাদার যদি রমাযান মাসে (দিনের বেলায়) রোযা অবস্থায় হারাম তথা নিষিদ্ধ বাক্যালাপ করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে কি?

উত্তর ঃ আমরা যদি আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করি তাহলে সিয়াম বা রোযা ওয়াজিব হওয়ার হিকমত কী তা জানতে পারি। আল্লাহ্ বলেন, ''হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান ফরয করা হল যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার'' (সূরা বাক্বারা ১৮৩ নং আয়াত)।

এখানে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, সিয়াম ওয়াজিব করার হিকমত হচ্ছে, তাকওয়া হাসিল ও আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। আর তাকওয়া হচ্ছে, যাবতীয় হারাম বিষয় বর্জন করা। সাধারণভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যাবতীয় নির্দেশ পালন ও নিষিদ্ধাবলী বর্জন করাকে তাকওয়া বলে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় মিথ্যা কথা ও কর্ম এবং মূর্খতা ও অজ্ঞতা বর্জন করল না তার খাদ্য ও পানীয় বর্জন করার আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজন নেই'' এটাই যাবতীয় হারাম কথা ও কর্ম হতে বেঁচে থাকার প্রতি রোযাদারকে হুঁশিয়ার করে। অতএব মানুষের গীবত করবে না, মিথ্যা বলবে না, নিজেদের মধ্যে চুগলখোরী করবে না, হারাম পন্থায় ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং সর্বপ্রকার হারাম হতে দূরে থাকবে। যদি কোনো মানুষ পূর্ণ রমাযান মাসে এগুলি পালন করে চলে তাহলে রমাযান পরবর্তী সময়েও তার আত্মাকে কন্ট্রোল করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে ইন্‌শা-আল্লাহ্। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, অধিকাংশ মানুষই রোযার দিন ও অন্যদিনের মধ্যে কোনোই পার্থক্য করে না বরং সাধারণ আদত তথা অভ্যাস অনুযায়ী মিথ্যাচর্চা, ধোকাবাজী, প্রতারণা ইত্যাদি হারামে লিপ্ত হয়ে যায়। রোযার মর্যাদা রক্ষা করা তার উপর অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ছিল সে বিষয়ে মোটেই খেয়াল করে না। হ্যাঁ, এসব কর্ম রোযা বাতিল করে না ঠিক কিন্তু নেকী কমে যায়। আবার এমনও হতে পারে যে, এ গুনাহের কারণে রোযার নেকী সবই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৩। প্রশ্ন ঃ রমাযানের কাযা রোযা আদায় করার পূর্বে শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা আদায় করা জায়েয হবে কি? রমাযানের কাযা আদায়ের নিয়তে ও সোমবারের নেকী লাভের আশায় শাওয়াল মাসের সোমবার দিন রোযা রাখা কি জায়েয?

উত্তর ঃ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত রমাযানের রোযা পূর্ণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার সোওয়াব হাসিল করতে পারবে না। অতএব যদি কারো রমাযান মাসের রোযা কাযা হয়ে থাকে তাহলে সেই কাযা রোযা আগে আদায় করবে তারপর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা করবে; কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন , ''যে ব্যক্তি রমাযান মাসের রোযা রাখল অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করল....''। এর ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, যার রমাযানের রোযা কাযা থাকবে সে প্রথমে রমাযানের কাযা রোযা সম্পন্ন করবে অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি রোযা আদায় করবে। তবে শাওয়ালের এই ছয়টি রোযা আদায় করা কালীন যদি সোমবার কিংবা বৃহস্পতিবার পড়ে যায় তাহলে এ ছয়টি রোযার সোওয়াবের সাথে সাথে সোমবার ও বৃহস্পতিবারেরও নেকী হাসিল করবে। কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''প্রতিটি আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রতিটি মানুষের জন্য তা-ই হবে যা সে নিয়ত করবে।''

৪। প্রশ্ন ঃ রমাযান মাসে রোযা অবস্থায় চিকিৎসার জন্য স্যালাইন গ্রহণ করলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ চিকিৎসার জন্য যে স্যালাইন ব্যবহার করা হয় তা দুই ধরণের যথা ঃ (ক) খাদ্য জাতীয় স্যালাইন, যা ব্যবহার করলে খাদ্য ও পানের চাহিদা পূরন করে। এরূপ স্যালাইন ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে, যাতে আসল রূপের সাথে কোনো প্রকার মিল বা সাদৃশ্য থাকবে তাতে আসল রূপেরই বিধান বাস্তবায়িত হবে।

(খ) খাদ্য বিহীন স্যালাইন ঃ এতে খাদ্য ও পানের চাহিদা

মেটায় না। এরূপ স্যালাইন ব্যবহারে রোযা নষ্ট হবে না। কেননা এতে শাব্দিক ও পারিভাষিক কোনো প্রকার মূলনীতি পাওয়া যায় না। তাছাড়া এটা খাদ্য ও পানীয় নয় এবং খাদ্য ও পানীয়'র বিকল্পও নয়। আর রোযা ভঙ্গের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, শরীয়ত সম্মত রোযা ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত রোযা সহীহ হবে।

৫। প্রশ্ন ঃ গলায় গড় গড়া করার ঔষধ ব্যবহার করলে সিয়াম বাতিল হয়ে যায় কি?

উত্তর ঃ ভিতরে প্রবেশ না করলে রোযা বাতিল হবে না, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত গলায় গড়াগড়া করার ঔষধ ব্যবহার না করাই উত্তম। যদি (পেটের) কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরে না পৌঁছে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

৬। প্রশ্ন ঃ রমাযান মাসে রোযাবস্থায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তার সিয়াম সহীহ্ হবে কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে কাবীরা গোনাহের অন্তর্ভূক্ত। মিথ্যা সাক্ষ্য হচ্ছে, কোনো বিষয়ে না জেনে সাক্ষ্য দেওয়া অথবা জেনেও তার বিপরীত সাক্ষ্য দেওয়া। এ কারণে রোযা বাতিল হবে না তবে নেকি কমে যাবে।

৭। প্রশ্ন ঃ সিয়ামের (রোযার) সামাজিক কোনো উপকারিতা বা প্রভাব আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সিয়ামের সামাজিক উপকারিতা অবশ্যই রয়েছে। যেমন মানুষ এটা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা একই উম্মাত, তারা একই সময়ে খায় এবং একই সময়ে রোযা পালন করে। আর ধনীরা আল্লাহ্র নেয়া'মতের কথা অনুভব করতে পারে, ফকিরদের প্রতি দয়াপরবশ হয় এবং শয়তানও মানুষকে খুব কম বিভ্রান্ত করতে পারে। আর সিয়াম দ্বারা আল্লাহ্ ভীতি মজবুত হয় ও সমাজের মানুষের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

৮। প্রশ্ন ঃ আমার পিতা অসুস্থতার কারণে ২১শে রমাযান রোযা ভেঙ্গে দেন এবং মেডিক্যাল চিকিৎসাধীন থাকা কালে নয়-ই শাওয়াল মারা যান। তাঁর সিয়ামের বিধান কী হবে?

উত্তর ঃ রোগ যদি এমন হয় যে, তা দূর হওয়ার আশা করা যায় না তাহলে প্রতি দিনের রোযার বদলে একজন মিসকিনকে খাবার দিবে। আর যদি এমন রোগ হয় যা আরোগ্য লাভের আশা করা যায় কিন্তু রমাযান শেষ হওয়ার পরই মারা যায় যা আপনার প্রশ্নে স্পষ্ট হয়েছে, এরূপ হলে তার উপর কোনই বিধান অর্পিত হবে না, কেননা আসলে এ রোযার কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব কিন্তু সে তার সুযোগ পায়নি (সুস্থ হওয়ার পূর্বেই মারা গেছে, কাজেই তার কোনো কাফ্ফারা লাগবে না)।

৯। প্রশ্ন ঃ যে মুসলমান রোযা করে কিন্তু নামায আদায় করে না তাকে কিছু কিছু উলামা খুব দোষারোপ করেন ও ধিক্কার দিয়ে থাকেন। অতএব সিয়ামের সাথে নামাযের কী সম্পর্ক রয়েছে? আর আমি রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আশায় সিয়াম পালন করি। তাছাড়া দুই রমাযানের মধ্যবর্তী সময়ের কৃত গোনাহের জন্য পরবর্তী রমাযান কাফ্ফারা স্বরূপ। অতএব এ বিষয়ে আপনার নিকট বিস্তারিত জানতে চাই? আল্লাহ্ আপনাকে তাওফীক দান করুন।

উত্তর ঃ আপনি সিয়াম পালন করেন অথচ সলাত আদায় করেন না, এজন্য যারা আপনাকে দোষারোপ করেন তাঁরা সঠিক কারণেই আপনাকে দোষারোপ করে থাকেন। কেননা এ সলাতই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি বা স্তম্ভ এবং এ সলাত ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকে না। আর এ সলাত ত্যাগকারী কাফের ও মিল্লাতে ইসলাম হতে বাহিরে অবস্থানকারী। আল্লাহ্ কোনো কাফেরের সিয়াম, সাদ্কা, হজ্জ ইত্যাদি এছাড়াও অন্যান্য সৎ আমল কবুল করেন না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''আর তাদের দান খায়রাত গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এ জন্য যে, তাঁরা আল্লাহ্র সাথে ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তাঁরা সলাতে শিথিলতার সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ দান করে'' (সূরা তাওবাহ্ ৫৪)। আপনি রোযা রাখেন অথচ নামায আদায় করেন না। অতএব আমরা এর ভিত্তিতে আপনাকে বলতে পারি যে, আপনার সিয়াম বাতিল, সহীহ্ বা শুদ্ধ নয়। এ সিয়াম আল্লাহ্র নিকট আপনার কোনোই উপকারে আসবে না এবং এ সিয়াম দ্বারা আপনি আল্লাহ্র নৈকট্যও লাভ করতে পারবেন না। আর এক রমাযান বিগত রমাযানের (দুই রমাযানের) মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহ্ কাফ্ফারা বলে আপনি যে ধারণা করেন, সে সম্পর্কে আমরা অপনাকে বলতে পারি যে, এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি আপনি ভালভাবে অবগত নন। কেননা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম'আহ হতে অপর জুম'আহ্ এবং এক রমাযান থেকে অপর রমাযান মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ যদি সে কাবীরা

গোনাহ্ হতে বিরত থাকে'। এক রমাযান থেকে অপর রমাযানের মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহের মাফ হওয়ার জন্য নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একটি শর্তারোপ করেন, তা হচ্ছে যাবতীয় কাবীরা গোনাহ্ হতে নিজেকে হেফাযত করা। আর আপনি এমন ব্যক্তি যে, সিয়াম পালন করেন কিন্তু সলাত আদায় করেন না, ফলে আপনি নিজেই কাবীরা গোনাহ্ হতে বাঁচতে পারেননি। সলাত তরকের চাইতে অধিক বড় কাবীরা গোনাহ আর কী হতে পারে ? বরং সলাত ত্যাগ করা হচ্ছে কুফরী। সুতরাং সলাত তরকের মাধ্যমে আপনি যে কুফরী করছেন তাতে আপনার সিয়াম কীভাবে আপনার গোনাহ্ মাফ করবে ? সলাত তরকের মত কুফরী করার কারণে আপনার সিয়াম কবুল করা হবে না। অতএব খালেস তাওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা, আল্লাহ্ কর্তৃক ফরযকৃত সলাত আদায় করা অতঃপর সিয়াম পালন করা আপনার উপর ওয়াজিব। এজন্যই রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন মা'আয বিন জাবাল (রাযি আল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন বলেন, তুমি তাদেরকে প্রথমে " লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্র রসূল" এ সাক্ষ্যের দাওয়াত দিবে। যদি তারা একথা মেনে নেয় তাহলে আল্লাহ্ তাদের উপর দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন একথা অবহিত করবে। যেহেতু দুই সাক্ষ্যের পর সলাত অতঃপর যাকাতের বিধান দিয়ে শুরু করলেন। সুতরাং সলাতের গুরুত্ব অনেক বেশি।

১০। প্রশ্ন ঃ আমি শুনেছি যে, মেহেদি ব্যবহার করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়। অতএব সিয়াম ও সলাত অবস্থায় মাথায় (চুলে) মেহেদি ব্যবহার করা জায়েয হবে কি ?

উত্তর ঃ একথার কোনো সহীহ্ ভিত্তি নেই, কেননা চোখের সুরমা, চোখে ও কানে ড্রপ ব্যবহারের ন্যায় সিয়াম অবস্থায় মেহেদি ব্যবহার করলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। এমনকী রোযাদারের উপর কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়াও পড়বে না। কেননা এসব কিছুই রোযাদারের কোনো ক্ষতি করে না এবং রোযাও ভঙ্গ করে না। আর মেহেদি ব্যবহার অবস্থায় নামায পড়ার প্রশ্নটি কেমন প্রশ্ন তা বুঝতে পারছি না, কারণ নামায চলা অবস্থায় মেহেদী লাগানোর প্রশ্নই উঠে না, নামায অবস্থায় তা সম্ভব নয়। হয়তবা তিনি জানতে চাচ্ছেন যে, কোনো মহিলা যদি মেহেদি ব্যবহার করে তাহলে তার অযু সহীহ্ হবে কিনা ? মেহেদি অযু শুদ্ধ হওয়ার প্রতিরোধক নয়। কেননা মেহেদির এমন কোনো প্রতিক্রিয়াশীল রূপ নাই যাতে অযুর স্থানে পানি পৌছাতে বাধার সৃষ্টি করবে। এটা কেবল একটি রং মাত্র। আর যা অযু নষ্টের কারণ হয় তাতে প্রতিক্রিয়াশীল রূপ থাকে ফলে পানি পৌছতে বাধার সৃষ্টি করে, তা দূর করা অবশ্য জরুরী যেন অযু সহীহ্ হয়।

জবাব ঃ শায়খ আব্দুল্লাহ্ আল জিবরীন হাফিযাহুল্লাহ্ তাআলা

১। প্রশ্ন ঃ এক মসজিদের ইমাম তারাবীর নামাযে প্রতি রাকআতে পূর্ণ এক পৃষ্ঠা বা প্রায় পনেরো আয়াত পাঠ করেন ফলে মুসল্লিদের অনেকেই বলেন, ক্বিরাত অনেক লম্বা হচ্ছে আবার কেউ এর বিপরীত বলেন। অতএব তারাবীর নামাযে কী পরিমাণ তিলাওয়াত করা সুন্নাত ? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তারাবীহ্ নামাযের কোনো সীমা বা সংখ্যা বর্ণনা করেছেন কি ? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রমাযান মাসে ও অন্য মাসের রাতে এগারো রাকাআত নামায পড়তেন। কিন্তু নামাযের রুক্ন আরকান সহ ক্বিরাত দীর্ঘ করতেন। এমনকী তিনি একদা এক রাকাআতেই ধীর-স্থীরভাবে তারতীল সহ পাঁচ পারা তিলাওয়াত করেন। আরও প্রমাণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মধ্য রাতে কিংবা তার একটু আগে কিংবা একটু পরে রাতের সলাত শুরু করে ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আদায় করতেন। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী মাত্র তের রাকাআত নামায পড়তেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ক্বিরাত সহ রুক্ন আরকান ধীর স্থিরভাবে লম্বা করে পড়তেন।

অনুরূপভাবে উমার (রাযি আল্লাহু আনহু) যখন সাহাবাদেরকে তারাবীহ্র সলাতের জন্য একত্র করলেন তখন তাঁরা এক রাকাআতেই সূরা বাক্বারার ত্রিশ আয়াত যা প্রায় চার অথবা পাঁচ পৃষ্ঠা পরিমাণ তিলাওয়াত করেন। অতএব তাঁরা যদি বারো রাকাআতে সূরা বাক্বারা পূর্ণ তিলাওয়াত করতেন তাহলে তা তাঁরা হালকা মনে করতেন। তারাবীহ্র নামাযে এরূপ করাই হচ্ছে সুন্নাত। আর তারাবীহ্ নামাযের ক্বিরাআতের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়বে

যাতে এতমিনান ও ধীর স্থিরতা হাসিল হয়। যেন এক ঘণ্টা বা অনুরূপ সময়ের কম না হয়। এর পরও যারা এটাকে দীর্ঘায়িত বলে মনে করবে তারা সুন্নাতের খেলাফ করবে। সুতরাং এরূপ কথার প্রতি কোনোই গুরুত্ব দেওয়া যাবে না।

২। প্রশ্ন ঃ তারাবীহ্‌র সলাত যুহরের ন্যায় দুই রাকআত পরে তাশাহ্হুদের জন্য বসুক অথবা না বসুক এক সালামে চার রাকাআত করে পড়ার বিধান কী?

উত্তর ঃ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, ''রাতের সলাত দুই রাকাআত দুই রাকাআত করে...'' এতে প্রমাণিত হয় প্রতি দুই রাকাআতের পর সালাম ফেরানো। তারাবীহ্‌র সলাতে সাহাবায়ে কিরাম ও আয়েম্মায়ে এযাম হতে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কিয়াম ও রুকু সাজদা অনেক দীর্ঘ করতেন এবং প্রতি চার রাকাআত অন্তর একটু বিশ্রাম নিতেন। আর এজন্যই এ সলাতকে তারাবীহ্ তথা বিশ্রামের সলাত নামকরণ করা হয়েছে। তবে বিতর সলাত তিন রাকআত অথবা পাঁচ রাকাআত কিংবা সাত রাকাআত একই সালামে পড়া জায়েয, সব শেষ রাকাআতে সালাম ফেরাবে। আয়েশা (রাযি আল্লাহু আনহা) কর্তৃক সহীহ্ হাদীসে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে।

৩। প্রশ্ন ঃ আমি প্রায় সতের বছরের এক যুবতী, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমি গত দুই বছর পূর্বে রমাযান মাসের যে রোযা ভঙ্গ করেছিলাম তার কাযা এখনও আদায় করিনি। অতএব এখন আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ ধারাবাহিকভাবে না হলেও পৃথক পৃথকভাবে অতি শীঘ্রই ঐ দিনগুলির রোযার কাযা আদায় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এক বছরেরও অধিক কাল বিলম্বের জন্য কাফ্ফারাও দিতে হবে। আর কাফ্ফারা হচ্ছে, প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করা। জমহুর উলামা অনুরূপই বলেন।

৪। প্রশ্ন ঃ আমি অল্প বয়সে বিবাহ করি, ফলে রোযার মাসে রোযার সংকল্প করার পর ফজর আযানের পরও আমি স্ত্রী সহবাস করে বসি, এরূপ ঘটনা দুদিন ঘটেছে অবশ্য প্রতিদিন একবার করে। জ্ঞাতব্য যে, এব্যাপারে আমার স্ত্রীও একমত ছিল। অতএব আমার ওপর কি কাফ্ফারা ওয়াজিব এবং আমার স্ত্রীর ওপর কি কাফ্ফারা ওয়াজিব তা আপনার নিকট জানতে চাই। উল্লেখ্য যে, এভাবে পাঁচ বছরেরও অধিক সময় অতিক্রম হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আপনাদেরকে অসংখ্য উত্তম জাযা দান করুন, অস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর ঃ উল্লেখিত দু'দিনের রোযার কাযা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। সেই সাথে রমাযান মাসে রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসের কারণে আপনার ওপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব। এর কাফ্ফারা হচ্ছে, জেহারের কাফ্ফারার অনুরূপ, আর তা হচ্ছে, একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করবে, তা যদি না পায় তাহলে ধারাবাহিকভাবে দুইমাস রোযা রাখবে, এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করবে। অনুরূপভাবে আপনার স্ত্রীর উপরও রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব। এজন্য যে, সে এটা হারাম জেনেও তাতে সম্মতি দিয়েছে।

জবাব ঃ সরল পথ পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ যাকাতুল ফিতরে অর্ধ সা' গমের হাদীস আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী সহীহ্ বলেছেন, কিন্তু ওয়াবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরী উক্ত হাদীসকে যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন (সহীহুল জামে ২৪১, সিলসিলা সহীহাহ্ ১১৭৭, মিরআত ৩/৯৭-৯৮)। কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ ওয়াবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরীর উক্তিই সঠিক অর্থাৎ যাকাতুল ফিতরে অর্ধ সা' গমের হাদীস যঈফ (মিরআত ৩/১০৪)। আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে মুসনাদ ধরে সহীহ্ বলেছেন, কিন্তু এতদ্সত্বেও হাদীসটি সহীহ্ হবে না। কারণ উক্ত সনদের রাবী ইবনু জুরাইয মুদাল্লিস। আর উক্ত হাদীস ইবনু জুরাইযের আন্‌আন দিয়ে বর্ণিত। আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানীও তাকে মুদাল্লিস বলেছেন। (সিলসিলা সহীহাহ্ ১/৪৫৪)

২। প্রশ্ন ঃ একজন হাফিযে কুরআনের বয়স ১৩ বছর ২ মাস। তার পিছনে তারাবীর স্বলাত হবে কি?

উত্তরঃ— হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/২৮৫, নাসাঈ ৭৮৯, আবূ দাউদ ৫৮৫, সহীহ্ ইবনু খুযাইমা ১৫১২)। আমর বিন সালিমা (রাযি আল্লাহু আনহু) প্রায় ৭ বছর বয়সে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে ফরয স্বলাতে ইমামতি করতেন (ফাৎহুল বারী ২/১৮১)। উল্লেখ্য মুকাল্লিদরা বলেছেন, ''এ ঘটনা ইসলামের প্রাথমিক যুগের, পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গিয়েছে।" তাদের এ দাবী দলীলবিহীন হওয়ার সাথে সাথে ডাহা মিথ্যা। কেননা আমর বিন সালিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অত্র ইমামতির ঘটনা মক্কা বিজয়ের পরের (বুখারী ৪৩০২)।

শবেক্বদর

আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ নিয়ামতসমূহের অন্যতম

সামিদুর রহমান তাইমী

বিশ্ব মানবের মুক্তির দিশারী মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে একটি হল রমাযান মাসের রোযা রাখা'' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২ পৃঃ)। এ মাসে মহান আল্লাহ্ বান্দাদেরকে কতকগুলি বিশেষ নিয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ামত হল, 'শবেক্বদর বা লাইলাতুল ক্বদর'। বক্ষমান প্রবন্ধে শবেক্বদর কী, তার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কতটুকু এবং তার আহকামই বা কী, তা নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

আরবী 'লাইলাতুল ক্বদর' এর ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দী অর্থ হল শবেক্বদর। আরবী 'লাইলা' এবং ফার্সীতে 'শব' শব্দের মানে হল রাত। কিন্তু 'ক্বদর' শব্দের অর্থ বিভিন্ন হতে পারে। যার জন্য এর নামকরণের কারণও বিভিন্ন। যেমন

(১) আরবী ক্বদর মানে তক্বদীর, সুতরাং লাইলাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরের মানে তক্বদীরের রাত বা ভাগ্য রজনী। যেমন আল্লাহ্ বলেন —

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ

অর্থঃ এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালা করা হয় (সূরা দুখান আয়াত ৪)।

আর এই তক্বদীর যা বাৎসরিক বিস্তারিত আকারে লিখা হয় । আর আদী তক্বদীর; যা মহান আল্লাহ্ আসমান যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে 'লাওহে মাহফুয' এ লিখে রেখেছেন (মুসলিম, মিশকাত ১৯ পৃঃ)।

২। ক্বদরের আর একটি অর্থ হল - ক্বদর, শান, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য। যেমন আল্লাহ্ বলেন —

وَ مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

অর্থ ঃ এই লোকেরা মহান আল্লাহ্র যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (সূরা আনআম, আয়াত ৯১)।

সুতরাং এ অর্থে লাইলাতুল ক্বদরের মানে হয় মর্যাদাপূর্ণ রাত। আর যে ব্যক্তি শবেক্বদরে রাত জেগে ইবাদত করে সে অতি মর্যাদার অধিকারী হয় এবং আল্লাহ্র কাছে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৩। ক্বদরের আর এক মানে হল সংকীর্ণতা। আল্লাহ্ বলেন—

مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ

অর্থ ঃ যার রুযী কমিয়ে দেওয়া হয়েছে (সূরা তালাক্ব, আয়াত ৭)। এখানে তথা এ রাতে সংকীর্ণতার অর্থ হল এই যে, এ রাতে আসমান থেকে এত বেশি সংখ্যক ফিরিশ্তা অবতরণ করেন যে, পৃথিবীতে তাঁদের জায়গা হয় না, অর্থাৎ তাঁদের সমাবেশের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে উঠে। তাই এ রাতকে শবেক্বদর বা সংকীর্ণতার রাত বলা হয় (আব্দুল হামীদ রচিত রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল ১১৮ পৃঃ)।

মাস ও তারিখ ঃ ক্বদরের রাতটি রমাযান মাসেরই কোনো একটি রাত (সূরা বাক্বারা ১৮৫ আয়াত, সূরা ক্বদর ১ আয়াত)। আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেন, একদা লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন আমি তা শুনছিলাম। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তা প্রত্যেক রমাযানেই হয় (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১৯৬ পৃঃ) এবং এই গুরুত্বপূর্ণ রাতটি রমাযানের শেষ দশকে বিদ্যমান। এর প্রমাণে আবু সায়ীদ খুদরী (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রমাযানের ১ম দশকে ই'তেকাফ করেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় দশকেও ই'তেকাফ করেন। তারপর তাবু থেকে মুখটা বের করে বললেন, ''আমি শবেক্বদর অন্বেষণের জন্যই রমাযানের ১ম ও ২য় দশকে ই'তেকাফ করলাম। তারপর আমাকে বলা হল যে, ঐ রাত (রমাযানের) শেষ দশকে আছে ...... (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ, ইবনে মাজাহ্ ১২৭ পৃঃ)। উক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, শবেক্বদর রমাযানের শেষ দশকের বিজোড় তথা ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ রাত্রিগুলির কোনো একটিতে হয়।

সময়সীমা ঃ শবেক্বদর মর্যাদার রাতের বর্ণনায় ক্বুরআন ও হাদীসে 'লাইলতুন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর লাইলাতুন বলা হয় সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে। সুতরাং শবেক্বদরের সময় সীমা হল সূর্যাস্ত থেকে ফজরের উদয় তথা সূর্যোদয় পর্যন্ত। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''শান্তি এই (শবেক্বদর) রাতের ফজর উদয় পর্যন্ত'' (সূরা ক্বদর ৫ আয়াত)।

আলামত সমূহ ঃ শবেক্বদরের কিছু আলামত বা নিদর্শন এ রাতের মধ্যেই দেখা যায় আর কিছু আলামত আছে যা রাতের পরে সকালে দেখা যায়। যে সব আলামত রাতে পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ—

১। শবেক্বদরের রাতে আকাশে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা থাকে।

২। অন্যান্য রাতের তুলনায় মু'মিন ক্বদরের রাতে কিয়াম বা নামাযে অধিক মিষ্টতা অনুভব করে।

৩। অন্যান্য রাতের তুলনায় ক্বদরের রাতে মু'মিনের হৃদয়ে এক ধরণের প্রশস্ততা, স্বস্তি ও শান্তি বোধ হয়।

৪। এই রাতে বাতাস নিস্তব্ধ থাকে অর্থাৎ সে রাতে ঝোড়ো হাওয়া বা জোরে হাওয়া প্রবাহিত হয় না। আবহাওয়া অনুকূল থাকে। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''ক্বদরের রাত উজ্জ্বল'' (আহমদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ্ ২১৯২; সহীহুল জামেইস সাগীর ৫৪৭২, ৫৪৭৫ নং)। অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, ''নাতিশীতোষ্ণ; না ঠাণ্ডা, না গরম'' (প্রাগুক্ত)।

৫। শবেক্বদরের রাতে উল্কা ছুটে না (প্রাগুক্ত)।

৬। এ রাতে বৃষ্টি হতে পারে। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আমাকে শবেক্বদর দেখানো হয়েছিল; কিন্তু পরে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে তা অনুসন্ধান কর, আর আমি দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদাতে সাজদাহ্ করছি'' (বুখারী ২০১৬, মুসলিম ১১৬৭ নং)। অতঃপর ২১শে রাত্রিতে সত্যিই বৃষ্টি হয়েছিল।

৭। শবেক্বদর কোনো নেক বান্দা স্বপ্নের মাধ্যমেও দেখতে পারেন। যেমন কিছু সাহাবা তা দেখেছিলেন।

পক্ষান্তরে যে সব আলামত রাতের পরে সকালে দেখা যায় তা হল এই যে, সে রাতের সকালে উদয় কালে সূর্য হবে সাদা, তার কোনো কিরণ থাকবে না (মুসলিম ৭৬২ নং)। অথবা ক্ষীণ রক্তিম অবস্থায় উদিত হবে (সহীহুল জামেইস সাগীর ৫৪৭ নং) ঠিক পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত অর্থাৎ তার রশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হবে না।

আর লোকের মুখে যে সব আলামতের কথা প্রচলিত আছে যেমন, সে রাতে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে না বা কম করে, গাছপালা মাটিতে নুয়ে পড়ে আল্লাহ্‌কে সাজদা করে, সমুদ্রের লবণাক্ত পানি মিঠা হয়ে যায়, নূরের ঝলকে অন্ধকার জায়গা আলোকিত হয়ে যায়, নেক লোকেরা ফিরিশতার সালাম শুনেতে পান ইত্যাদি আলামতসমূহ কাল্পনিক। এগুলি শারয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাছাড়া এসব কথা নিশ্চিতরূপে অভিজ্ঞতা ও বাস্তববিরোধী (দুরূসু রামাযান অকাফাত লিস সায়েমীন, ৯২ পৃঃ, আশ্ শারাহুল মুমতে ৬/৪৯৮-৪৯৯. রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল ১২২ পৃঃ)।

মাহাত্ম্য ঃ ১। শবেক্বদরের মাহাত্ম্য ও ফযীলত বর্ণনা করার জন্য মহান আল্লাহ্ ক্বুরআন মাজীদে পূর্ণ একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই সূরার নামকরণও করেছেন তারই নামে। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''নিশ্চয় আমি ঐ ক্বুরআনকে শবেক্বদরে অবতীর্ণ করেছি।''

২। শবেক্বদর হল হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম'' (সূরা ক্বদর ৩ আয়াত)। এক হাজার মাস সমান ৩০ হাজার দিন। আর ৩০,০০০ দিন সমান ৮৩ বছর ৪ মাস। সুতরাং যে ব্যক্তি এই রাতে ইবাদত করে, প্রকৃতপক্ষে সে যেন ৩০০০০ দিন অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাস অপেক্ষাও বেশি সময় ধরে ইবাদত করে।

৩। ক্বদরের রাত হল অতি বরকতময়, কল্যাণময় ও মঙ্গলময়। মহান আল্লাহ বলেন, ''আমি ক্বুরআনকে বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি'' (সূরা দুখান ৩ আয়াত)।

উক্ত বরকতময় রাত্রি হল 'লাইলাতুল ক্বদর' বা শবেক্বদর। আর শবেক্বদর নিঃসন্দেহে রোযার মাসে। প্রকাশ থাকে যে, ঐ রাত্রি শবেবরাতের রাত্রি নয়; যেমন অনেকে মনে করে থাকেন। কারণ, ক্বুরআন লাওহে মাহফুয থেকে অবতীর্ণ বা অবতরণ শুরু হয়েছে রমাযান মাসে। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''রমাযান মাস হল সেই মাস যে মাসে ক্বুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে'' (সূরা বাক্বারা ১৮৫ আয়াত)। তিনি আরও বলেন, ''নিশ্চয় আমি ক্বুরআনকে শবেক্বদরে অবতীর্ণ করেছি'' (সূরা ক্বদর ১ আয়াত)। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, শবেক্বদর হল রমাযানে; শা'বানে নয়।

৪। এটা হল সে রাত, যে রাতের মাহাত্ম্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে এই রাতে ফিরিশতামণ্ডলী অবতীর্ণ হন। যে সব কাজের ফায়সালা এ রাতে করা হয় তা কার্যকারী করার জন্য তাঁরা অবতরণ করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''সে রাতে ফিরিশতামণ্ডলী ও জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) তাঁদের রবের নির্দেশে সকল কাজের জন্য অবতীর্ণ হন।''

৫। এ রাত হল সালাম ও শান্তির রাত। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''সে রজনীতে ফজরের উদয় পর্যন্ত শান্তি বর্ষিত হয়'' (সূরা ক্বদর, ৫ আয়াত)।

৬। এই রাত সেই ভাগ্যময় রাত; যাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করা হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''সেই রাতে বড় বড় কাজের ফায়সালা করা হয়'' (সূরা দুখান, আয়াত ৪)।

শবেক্বদরের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের কারণে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই রাতটিকে খোঁজার জন্য একবার এক মাস ধরে ই'তেকাফ করেছিলেন (মুসলিম ১ম খণ্ড ৩৭০ পৃঃ, মিশকাত ১৮২ পৃঃ)। রমাযানের শেষ দশক এসে উপস্থিত হলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের কোমর বেঁধে নিতেন, সারা রাত জাগতেন এবং নিজ পরিবার পরিজনকেও জাগাতেন (বুখারী, মুসলিম, ইত্তেহাফুল কেরাম ৪৫৪ পৃষ্ঠা হাঃ ৫৬৯)।

করণীয় ও বর্জনীয় ঃ ক্বদরের রাত গুনাহ্- খাতা মাফ করার রাত। সুতরাং নামায, ক্বুরআন তিলাওত এবং তাসবীহ্ ও তাক্বীর পাঠের মধ্যে দিয়ে রাতটিকে অতিবাহিত করা উচিৎ। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত নেকীর আশা নিয়ে ক্বদরের রাতে কিয়াম করে (নামায পড়ে) তাঁর পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'' (বুখারী, হাঃ নং ৩৫, মুসলিম ৭৬০ নং, সুনানে আরবায়া, রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল ১২০ পৃঃ)। পক্ষান্তরে এ রাতে ভোজের আয়োজন করা ও সাহারী পার্টির নামে গ্রামে গ্রামে গজল গেয়ে চাঁদা তুলে বেড়া এবং জামাতবদ্ধভাবে কবরস্থানগুলোতে গিয়ে যিয়ারত ও হাত তুলে দুআ করা ভিত্তিহীন প্রথা মাত্র। ক্বদরের রাত জাগার যে প্রথা বা রীতির প্রচলন দেখা যায়, যেমন - সারা রাত মাইক বাজিয়ে জালসা করা, বিশেষ ভোজের মাধ্যমে হৈ হুল্লোড় করে রাত পার করা, সবই ইসলাম বহির্ভূত কাজ।

এ রাতে যে দুআ পাঠ করতে হয় ঃ মা আয়েশা (রাযি আল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! আমি শবেক্বদর লাভ করলে কোন দুআ পাঠ করব? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''এই দুআ বলবে ঃ ''আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফু'উন্ তুহিব্বুল আ'ফঅ ফা'ফু আন্নী''। হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালোবাসো। অতএব তুমি আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করো (তিরমিযী, মিশকাত ১৮২ পৃঃ)।

পরিশেষে দুআ করি, হে আল্লাহ্! তুমি বিশ্ব মুসলিমকে শবেক্বদরে যথাযথ ইবাদত করার তাওফীক দাও, আমীন।

কবিতা :

প্রিয় দাস

মোহাঃ তাওহীদুর রহমান

তোমার প্রিয় দাস হতে চাই আমি
হে প্রভু! আমার অন্তর্যামী।

যে পথে চলেছিলেন
আম্বিয়ায়ে কেরাম,
যে পথে চলেছিলেন
সাহাবায়ে কেরাম,
আমিও তাঁদের মতো সেই পথে চলে
হতে চাই সফলকামী।
হে প্রভু আমার অন্তর্যামী।

নমরূদ, ফেরাউন, সামূদ সহ
আছে যত আর,
যুগে যুগে তোমায় যারা
করেছে অস্বীকার,
তাদের মতো কভু প্রভু গো যেন
না হই বিপথগামী।
হে প্রভু আমার অন্তর্যামী।

ঈদের খুশি

মহম্মদ শব্দর আলি

সিয়াম সাধনার শেষে মহামিলনে খুশিতে ভরবে মন,
আজ খুশিতে ফেটে চৌচির হবার দিন ক্ষণ।
খুশির মেলা বসেছে ঈদগাহের ঐ ময়দানে,
নতুন ভূষণে সাজলো, লাগলো দোলা সবার মনে।
রয় না কারো দুঃখ বেদনা এ খুশির দিনে,
কিন্তু সবার তবে এ খুশি হয় না সম বন্টনে।
ঈদের দিনে আমির ফকিরে দেখা হয় না কূল,
নিঃস্ব গরীবদের ছিন্ন বসন, তেলহীন মাথার চুল।
বাচ্চাদের পোশাক না দিতে পেরে মরছে বাবা লজ্জাতে,
খাবার নেই উপোস পেটে যাচ্ছে তারা ঈদগাহেতে।
ভিক্ষা করে অন্নের জন্য যাচাঞ্ঞা করে দ্বারে দ্বারে।
খুশির দিনটা তারা কেমন ভাবে পার করে?
রোযা রাখেনি, করে অতি হিংসা রেষারেষি,
সলাত-সিয়াম ছাড়ায় মূল্যবান পোশাকে মহাখুশি।
অসহায় অনাথ খাদ্য বস্ত্রের জন্য কাঁদে,
তবুও ধনীরা চলে রাশি রাশি আনন্দে।
আমির ফকিরের মহাখুশির হবে যে দিন,
রবে না ভেদাভেদ আনন্দিত হবে তাদের মন।
দ্বীনের নিশান উড়বে যেদিন এ ধরায়,
ঈদের খুশির সুখ লহরী ভরবে সেদিন পূর্ণতায়।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দাওয়াতের ফলে সমাজ নেতাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

উ:— রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আহ্বানের সত্যতা ও যর্থাথতার বিষয়ে সমাজ নেতাদের মধ্যে কোনো রূপ দ্বিমত ছিল না। কিন্তু ধুরন্ধর নেতারা তাওহীদের অমর আহ্বানের মধ্যে তাদের দুনিয়াবী স্বার্থের নিশ্চিত অপমৃত্যু দেখতে পেয়েছিল। আল্লাহ্কে মেনে নিলে দেব-দেবীর পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে সারা আরবের উপর তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পৌরহিত্যের মর্যাদা শেষ হয়ে যাবে। লোকেদের নিবেদিত পূজার অর্ঘ্য ভোগ করা থেকে তারা বঞ্চিত হবে এবং তাদের মনগড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধানসমূহ বাতিল হয়ে যাবে।

২। প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর অর্পিত অপবাদগুলির বর্ণনা পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে?

উ:— (ক) তিনি পাগল (খ) কবি। তারা বলল, আমরা কি একজন কবি ও পাগলের জন্য আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব? (৩৭:৩৬)।

(গ) জাদুকর, (ঘ) মহা মিথ্যাবাদী। কাফেররা বলল, এ লোকটি একজন জাদুকর ও মহা মিথ্যাবাদী (৩৮:৪)।

(ঙ) পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী, 'এটা পূর্ববর্তীদের মিথ্যা উপাখ্যান ব্যতীত কিছুই নয়' (৮:৩১, ৬৮:১৫)।

(চ) অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী। তারা বলে যে, তাকে শিক্ষা দেয় একজন মানুষ (১৬:১০৩)।

(ছ) মিথ্যা রটনাকারী। কাফেররা বলে, এটা বানোয়াট ছাড়া কিছুই নয় যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে (২৫:৪)।

(জ) গণক - 'অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উন্মাদ ও নও (৫২:২৯)

(ঝ) তিনি তো সাধারণ মানুষ ফেরেস্তা নন। তারা বলে,

এ কেমন রসূল যে খাদ্য ভক্ষণ করে ও হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার প্রতি কেন ফেরেস্তা নাযিল করা হল না, যে তার সাথে থাকতো সদা সতর্ককারী রূপে? (২৫:৭)।

(ঞ) পথভ্রষ্ট। যখন তারা ঈমানদারগণকে দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট (৮৩:৩২)।

(ট) ধর্মত্যাগী। আবু লাহাব বলত, তোমরা এর আনুগত্য করো না, কেননা সে ধর্মত্যাগী মহা মিথ্যাবাদী (আহমাদ হা: ১৬০৬৬, হাকেম হা: ৪২১৯, সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা: ৬৫৬২, সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্ হা: ১৫৯, দারাকুতনী হা: ২৯৫৭, সানাদ সহীহ্)।

(ঠ) পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী (ড) জামাআত বিভক্তকারী। মক্কার লোকেরা তাকে পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী ও জামাআত বিভক্তকারী বলত (ইবনু হিসাম ১/২৯৫)।

(ঢ) জাদুগ্রস্ত। যালেমরা বলে, তোমরা তো কেবল একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ (১৭:৪৭)।

(ণ) মুযাম্মাম। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামের বিপরীতে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) নামে ব্যঙ্গ কবিতা বলত (ইবনু হিসাম ১/৩৫৬)।

(ত) রা'এনা। মদীনায় হিজরতের পর সেখানকার দুরাচার ইহুদীরা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে 'রা'এনা' বলে ডাকত (২:১০৪)। তাদের মাতৃ ভাষা হিব্রুতে যার অর্থ ছিল 'আমাদের মন্দ লোকটি' (তাফসীর ইবনু কাসীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত নং ১০৪)।

৩। প্রশ্ন : কে কোথায় রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পায়ের গোড়ালীতে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল?

উ:— আবু লাহাব যুল মাজায বাজারে।

৪। প্রশ্ন : উপরোল্লিখিত অপবাদের জবাবে মহান আল্লাহ্ কী বলেন?

উ:— দেখ ওরা কীভাবে তোমার নামে (বাজে) উপমাসমূহ প্রদান করছে। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা আর পথ পেতে সক্ষম হবেনা (১৭:৪৮, ২৫:৯)।

৫। প্রশ্ন : নযর বিন হারেস কে ছিলেন, তিনি কীভাবে রসূলের দাওয়াতের বিরোধিতা করতেন?

উ:— অন্যতম কুরায়েশ নেতা ও বিত্তশালী ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি ইরাকের 'হীরা' নগরী থেকে পারস্যের প্রাচীন রাজা বাদশাদের কাহিনী রুস্তম ও ইস্ফিনদিয়ারের বীরত্বের কাহিনী শিখে এসে মক্কার বিভিন্ন স্থানে গল্পের আসর বসাতো। যেখানেই রসূল দ্বীনের দাওয়াত দিলেন, সেখানেই নযর বিন হারেস গিয়ে উক্ত সব কল্পকাহিনী শুনিয়ে বলতেন, এগুলো কি মুহাম্মাদের কাহিনীর চেয়ে উত্তম নয়? এতেও তিনি ক্ষান্ত না হয়ে অনেকগুলি সুন্দরী দাসী খরিদ করেন যারা নৃত্যু-গীতে পারদর্শী ছিল। তিনি তাদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে নাচ-গানের আসর বসাতেন এবং মানুষকে সেখানে আকৃষ্ট করতেন। এমনকী কোনো লোক মুহাম্মাদের অনুসারী হলে ঐ সব সুন্দরীদের তার পিছনে লাগিয়ে দিতেন এবং তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন (ইবনু হিসাম ১/৩০০)। উপরোক্ত ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপের প্রেক্ষিতেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়,

'লোকেদের মধ্যে একটা শ্রেণি আছে, যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অজ্ঞতাবশে অলীক কল্পকাহিনী ক্রয় করে এবং আল্লাহ্‌র পথকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি (৩১:৬)।

৬। প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর মক্কার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের মন্দ প্রতিক্রিয়ার অন্যতম কারণ কী?

উ:— গোত্রীয় হিংসা, ভালোর প্রতি হিংসা ও ব্যক্তি স্বার্থ। যেমন অন্য নেতা আখনাস বিন শরীক-এর উত্তরে আবু জাহল বলেন, বনু আব্দে মানাফের সঙ্গে আমাদের বংশ ও মর্যাদাগত ঝগড়া আছে। তারা বলবে, আমাদের বংশে একজন নাবী আছেন, যার নিকট আসমান থেকে 'অহী' আসে। আমরা কি ওই মর্যাদায় পৌঁছাব? অতএব আল্লাহ্‌র কসম আমরা কখনই তার প্রতি ঈর্ষা আনব না বা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করব না।

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ মুসাফিরের জন্য স্বলাত কসর পড়া উত্তম নাকি পূর্ণ পড়া উত্তম ? একজন মুসাফির কতদিন পর্যন্ত কসর করতে পারে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন ? — তাফাযযুল হক, রাজস্থান।

উত্তর ঃ মুসাফিরের জন্য স্বলাত কসর পড়া উত্তম। কিন্তু যদি মুকীম ইমামের অনুসরণে স্বলাত আদায় করে তবে স্বলাত পূর্ণ পড়া অপরিহার্য (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা : ২/৬/৪৬৫)। যদি ১৯ দিন কিংবা তার থেকে কম অবস্থানের নিয়ত করে তবে কসর স্বলাত আদায় করবে। আর যদি ১৯ দিনের বেশি অবস্থানের নিয়ত করে তবে পূর্ণ স্বলাত আদায় করবে। একথাই বলেছেন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) (মক্কাতে) ১৯ দিন অবস্থান করেন এবং স্বলাত কসর পড়েন। সুতরাং আমরাও ১৯ দিন সফরে থাকলে কসর করতাম এবং তার চেয়ে বেশি হলে স্বলাত পূর্ণ আদায় করতাম (বুখারী ১০৮০, ফাতাওয়া ইলমিয়্যাহ্ ১/৪৩৬-৪৩৭)।

২। প্রশ্ন : একটি বইয়ে পড়েছি, ‘‘আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ‘রামাহুরমুযে’ নয় মাস অবস্থান করেন এবং স্বলাত কসর পড়েন।’’ অত্র বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। — রমীশুন্ নিসা, রাজস্থান

উত্তর : বর্ণনাটি যঈফ। কারণ ইয়াহ্ইয়া বিন আবী কাসীর ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে (ইরওয়াল গালীল ৫৭৬)।

৩। প্রশ্ন : নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা মুসাফিরের অর্ধেক স্বলাত ও সিয়াম এবং গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধ দানকারিনী মায়ের জন্য মাফ করে দিয়েছেন (নাসাঈ)। এ হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন। — কারীমা, যুগোড়, সাগরদীঘি।

উত্তর : ‘মুসাফিরের জন্য অর্ধেক স্বলাত’ সফরের অবস্থায় চার রাকাআত বিশিষ্ট স্বলাত দু রাকাআত করে আদায় করতে হয়। অবশ্য মুকীম ইমামের পিছনে স্বলাত আদায় করলে তার অনুকরণে পূর্ণ স্বলাত আদায় করতে হবে এবং ‘মুসাফির, গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধ দানকারিনী মায়ের জন্য সিয়াম মাফ করে দিয়েছেন’—এর প্রাধান্যযোগ্য ব্যাখ্যা হল : রমাযান মাসে তাদের সিয়াম রাখা ও না রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। আর অর্ধেক স্বলাতের সম্পর্ক কেবলমাত্র মুসাফিরের জন্য। সুতরাং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা মুসাফির থেকে অর্ধেক স্বলাত হ্রাস করেছেন এবং মুসাফির, গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারিনীকে সিয়াম রাখার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন (ইবনু মাজাহ্ ১৬৬৭, আহমাদ ১৯৪৭)। গর্ভবতী মহিলা যদি গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে অথবা নিজের এবং দুগ্ধ দানকারিনী মা নিজের কিংবা শিশুর রমাযান মাসে ক্ষতির আশংকা করে তবে রমাযান মাসে সিয়াম না রেখে পরবর্তীতে কেবলমাত্র তার কাযা আদায় করবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/১০/২২০)। অত্র হাদীসকে কেন্দ্র করে ইমাম বাইহাকী অধ্যায় রচনা করেছেন, ‘‘গভবর্তী নারী ও দুগ্ধ দানকারিনী মহিলা সিয়াম রাখতে সামর্থ না হলে সিয়াম ভেঙ্গে দিবে এবং কাযা আদায় করবে, অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় তাদের ‘ফিদ্য়া’ দিতে হবে না’’ (আস্ সুনানুল কুবরা ৮০৮০ নম্বর হাদীসের শিরোনাম)।

৪। প্রশ্ন : নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআহ্র দিন সর্বোত্তম। এদিনই আদম (আলাইহিস্ সালাম) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদিনই শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং এদিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। অতএব তোমরা এদিন আমার প্রতি অধিক সংখ্যক দরূদ পেশ কর। কেননা তোমাদের দরূদ আমার সামনে পেশ করা হয়। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমাদের দরূদ আপনার নিকট কীভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন ? তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ভূমির জন্য নাবীগণের দেহ ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন। এ হাদীসের বরাতসহ বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন। — সানাউল্লাহ্, কালিয়াচক, মালদা।

উত্তর : হাদীসটি সহীহ্ (আবূ দাউদ ১০৪৭, ইবনু মাজাহ ১০৮৫, নাসাঈ ১৩৭৪, আহমাদ ১৬১৬২, সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্ ১৭৩৩, দারেমী ১৬১৩, মুস্তাদরাক ৯৬৪১, তাবারানী কাবীর ৫৮৯ প্রভৃতি)। হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন ইমাম হাকিম, যাহাবী, নাওবী,

ইবনু হাজার আসকালানী, শুআইব আরনাউত, আব্দুল কাদির আরনাউত, আইমান সালিহ্ শা'বান, মুহাম্মাদ মুস্তাফা আ'যামী, উবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরী, ইবনু বায এবং নাসিরুদ্দীন আলবানী প্রমুখগণ। প্রকাশ থাকে যে, কেউ কেউ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয় (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সহীহ্ আবূ দাউদ ৯৬২)।

৫। প্রশ্ন : শাওয়াল মাসের ৬টি সিয়ামের ফযীলত কী? যাদের রমাযান মাসের পূর্ণ কিংবা কিছু সিয়াম বাকি আছে, তারা শাওয়াল মাসের ৬টি সিয়াম রাখলে তার ফযীলত পাবে কি? শাওয়াল মাসের সিয়াম পৃথক পৃথক রাখা যায় নাকি ধারাবাহিক ভাবে রাখতে হবে? — আশরাফ মণ্ডল, মুল্লাসিমলা, হুগলী।

উত্তর : আবূ আইয়ুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি রমাযান মাসের সিয়াম রাখার পর শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম রাখবে, তা যেন সারা বছর সিয়াম রাখার সমতুল্য (মুসলিম ১১৬৪, ইবনু মাজাহ্ ১৭১৬, আবূ দাউদ ২৪৩৩)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দাস সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন সিয়াম রাখলো, তা পূর্ণ বছর সিয়াম রাখার সমতুল্য। কেউ কোনো সৎকাজ করলে, সে তার দশ গুণ পাবে (ইবনু মাজাহ্ ৭১৫, আহমাদ ২২৪১২, সহীহুল জামি ৬৩২৮)।

শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়ামের ফযীলত ও তাদের জন্যই যারা রমাযানের সিয়াম রাখার পর তা রাখবে। কারণ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, " যে ব্যক্তি রমাযানের সিয়াম রাখলো, অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম রাখলো।" অতএব যার রমাযানের সিয়াম বাকি আছে, সে আগে রমাযামের সিয়াম রাখবে। অতঃপর শাওয়াল মাসের সিয়াম রাখবে। অন্যথায় হাদীসে বর্ণিত ফযীলত পাওয়া যাবে না (ফাতাওয়া নূর শাইখ উসাইমীন ১১/২)। শাওয়ার মাসের ছয়টি সিয়াম পৃথক পৃথক ও ধারাবাহিক উভয় পদ্ধতিতেই রাখা জায়েয (মাজমূ ফাতাওয়া শাইখ ইবনু বায ১৫/৩৯১, ফাতাওয়া শাবাকাতে ইসলামিয়্যাহ ১১/১৮৩১৪)।

৬। প্রশ্ন : "যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের ৬টি সিয়াম রাখবে রমাযান মাসের সিয়াম রাখার পর, সে তার গুনাহ্ থেকে সেদিনের মত পবিত্র হয়ে যাবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল" এ হাদীসটি কোথায় আছে? তার সহীহ্ কিংবা যঈফ হওয়া সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। — মইনুল হক, হরিহরা, পাকুড়।

উত্তর : হাদীসটি অত্যন্ত যঈফ। এমনকী আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন (সিলসিলাতুল আহাদীসিয্ যাঈফাহ্ ৫১৯০, যঈফুত্ তারগীব ৬০৮)। হাদীসটি ইমাম ত্বাবারানী 'আল্ মু'জামুল আওসাত' গ্রন্থে ৮৬২২ বর্ণনা করেছেন।

৭। প্রশ্ন : কবরকে সিমেন্ট বালি দিয়ে মজবুত করে বাঁধানো এবং জন্ম তারিখ লিখা যাবে কি? কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে সৌদি ফাতাওয়া কমিটির ফাতাওয়া জানিয়ে বাধিত করবেন। — ইদ্রীস, নগাঁও, আসাম।

উত্তর : কবরকে সিমেন্ট বালি দিয়ে মজবুত করে বাঁধানো যাবে না। কারণ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কবরকে পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর বিল্ডিং নির্মাণ করতে নিষেধে করেছেন (মুসলিম ৯৭০, আবূ দাউদ ৩২২৫, নাসাঈ ২০২৮) এবং কবরের উপর লিখতে ও নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিষেধ করেছেন (তিরমিযী ১০৫২, আবূ দাউদ ৩২২৬)।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী কবরের উপর মৃতের জন্ম-তারিখ লিখাকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন (আহকামুল জানায়েয ২০৬ পৃঃ)।

সৌদী ফাতাওয়া কমিটি বলেছেন : কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ বৈধ নয় এবং কবরের উপর নির্মিত মসজিদে স্বলাত আদায় করাও বৈধ নয় (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/১/৩৯৯)।

৮। প্রশ্ন : নিফাসের চল্লিশ দিন শেষ হওয়ার আগেই পবিত্র হয়ে গেলে এবং চল্লিশ দিনের মধ্যেই পুনরায় স্রাব দেখা দিলে তার শরীয়তী হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন। — ফারীদা বিবি, লালগোলা।

উত্তর : নিফাস বিশিষ্ট মহিলা যদি চল্লিশ দিনের আগেই পবিত্র হয়ে যায় তবে নিফাস অবস্থার যাবতীয় নিষিদ্ধতা তা শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং স্বলাত আদায় করা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং নিফাসের জন্য যা তার জন্য অবৈধ হয়েছিল তা বৈধ হয়ে যাবে (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ২৬১ পৃঃ, ফাতাওয়া নূর ৭/২, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৫/৪৫৮)। কিন্তু চল্লিশ

দিনের মধ্যেই পুনরায় স্রাব দেখা দিলে তা নিফাস হিসাবে গণ্য হবে। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে নিফাসগ্রস্থা মহিলারা চল্লিশ দিন অপেক্ষা করতেন (আবূ দাউদ ৩১১, ইবনু মাজাহ্ ৬৪৮, তিরমিযী ১৩৯)। আর পবিত্র অবস্থায় যে স্বলাত ও সিয়াম প্রভৃতি আদায় করা হয়েছে তা বিশুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু বায ১৫/১৯৬)।

৯। প্রশ্ন : মৃতের নামে কুরআন পাঠ করা কি শরীয়ত সম্মত? — নযরুল ইসলাম, হুগলী।

উত্তর : মৃতের নামে কুরআন পাঠ শরীয়ত সম্মত নয়; বরং তা বিদআত। কারণ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও কোনো সাহাবী হতেই মৃতের নামে কুরআন পাঠ প্রসঙ্গে কিছুই বর্ণিত নেই। আর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে কেউ আমাদের এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/২০৪-২০৫)।

১০। প্রশ্ন : নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে যাকাতুল ফিত্‌র কি একত্রিত করা হতো দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন? — আফসার, হুগলী।

উত্তর : হ্যাঁ! একত্রিত করা হতো। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে রমাযানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলা ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন : আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হল, তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরাইরাহ্! তোমার রাতের বন্দী কী করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, সাবধান! সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কথা ''সে আবার আসবে'' দ্বারা বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরাইরাহ্! তোমার বন্দী কী করলে? আমি বললাম , হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, ফলে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, খবরদার সে তোমাকে মিথ্যা বলছে এবং সে আবার আসবে। সুতরাং আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হল তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস... (বুখারী ২৩১১)। রমাযানের যাকাত বলতে সকলের ঐক্যমতেই যাকাতুল ফিতর। ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী বলেন : সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যাকাতুল ফিতর বন্টনের আগে জমা করতেন এবং ঈদুল ফিতরের রাতে তা বন্টন করতেন (ফাৎহুল বারী)।

সংগঠন সংবাদ

বিগত ১৪.৫.১৭ তারিখ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলার আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব দারসে কুরআনে সূরাহ্ যুমার-র ৫৩ নং আয়াত থেকে ৬২ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের বলেন, ''হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছো তারা আল্লাহ্‌র করুণা ও রহমাত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত পাপ মাফ করে দিবেন কেননা তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা আল্লাহ্ অভিমুখী হও এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করো। তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের উপর অতর্কিতে শাস্তি আসার পূর্বে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করো।

আমীর সাহেব বলেন - উক্ত ১০টি আয়াতের মৌলিক শিক্ষা হল —

১। মুমিন কোনো দিন আল্লাহ্‌র রহমাত হতে নিরাশ হবে না। রাত যত অন্ধকার হবে সকাল ততখানি অগ্রবর্তী হবে। বিপদ যত বেশি হবে পুরস্কারের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। বান্দার চোখের অশ্রুতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নির্ভরশীল। যদি কান্না না আসে কান্নার ভান করে কাকুতি মিনতি প্রকাশ করেই পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

২। উত্তম আমল করতে হবে। খাঁটি আহ্‌লে হাদীসের লক্ষ্য জায়েয আমলের অনুসন্ধান নয় বরং উত্তম আমলের দিকে ধাবিত হওয়া। কয়েকটি আয়াত দ্বারা স্বলাত সম্পাদনের পরিবর্তে অধিক আয়াত পাঠ, দীর্ঘ রুকু, দীর্ঘ সাজদা ও দীর্ঘ কিয়াম দ্বারা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পদ্ধতি অর্জন করতে হবে। জীবনের সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র সমীপে সমর্পণ করতে হবে এমনকী সামান্য জুতোর ফিতে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

অতএব আসুন আগত রমাযান মাসের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করে আল্লাহ্ নির্দেশিত ও রসূলের সুন্নাহ্ মোতাবিক সঠিক আমল করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে অগ্রবর্তী হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করি।

এ সভায় যে সমস্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় সেগুলি হল — (১) জেলা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে সিলেবাস কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ২১শে মে, ২০১৭ বিকাল ৩ ঘটিকায় জমঈয়ত অফিস কক্ষে।

(২) জেলার মাসিক সভায় পূর্ব নির্ধারিত জেলা কমিটির নির্দিষ্ট সদস্য ছাড়া অন্য কোনো লোক অংশ গ্রহণ করবেনা।

(৩) 'স্বেচ্ছা দান প্রকল্পে' আরও বেশি করে জেলার সদস্যদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

(৪) আগামী রমাযান মাসের ও শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখা ও যথা সময়ে তা প্রচারের জন্য তিন সদস্যের যথাক্রমে জেলা আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী, আনওয়ারুল হক ফাইযী এবং নাজমে আলম সানাবিলী সাহেবদের সমন্বয়ে একটি কার্যকারী 'হিলাল কমিটি' গঠন করা হয়েছে। উক্ত 'হিলাল কমিটি' শা'বান মাসের ২৯ তারিখ ও রমাযানের ২৯ তারিখ যদি নতুন চাঁদ দেখতে পাওয়া যায় তাহলে সেই সংবাদ জেলা জমঈয়তের পক্ষ হতে মুর্শিদাবাদের সমস্ত ব্লকে যথাযথভাবে প্রচার করা হবে — ইনশাআল্লাহ্।

(৫) জেলা জমঈয়তের নেতৃত্বে আগামী ৭ জুলাই ২০১৭ তারিখ ২০১৭ সালের হজ্জ গমনেচ্ছুক ব্যক্তিদের নিয়ে সকাল ৮ ঘটিকায় একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে অফিস কক্ষে। উক্ত দিনে জেলার মাসিক সভাও অনুষ্ঠিত হবে - ইনশাআল্লাহ্।

(৬) মদীনা হতে সংগৃহীত 'সা' জেলা জমঈয়তের নির্দিষ্ট শীলমোহর লাগিয়ে আগামী জেলা সভায় সুষ্ঠুভাবে বিলিবন্টন করা হবে - ইনশাআল্লাহ্।

এরপরেই আমীর সাহেবের দুআ পাঠের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সভার কাজের সমাপ্তি ঘটে। ইতি —

জেলা সম্পাদক

জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে ১৪৩৮-১৪৩৯ হিজরীর সিলেবাস — জমঈয়তের কর্মীবৃন্দের জন্য

১। তিলাওয়াতে কুরআন।
২। ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামাতে দ্বীন — মুযাফ্‌ফর বিন মুহসিন।
৩। আহ্‌লে হাদীস একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম — যুবায়ের আলী যাঈ।
৪। সালাফী দাওয়াত — আসাদুল্লাহ্ আল গালিব।
৫। কিতাবুত তাওহীদ-এর ব্যাখ্যা — সলেহ আল ফাওযান ফাওযান।
৬। তাফসীর আহসানুল বায়ান — আব্দুল হামীদ মাদানী।
৭। তাফসীরুল কুরআন আম্মাপারাহ্ — আসাদুল্লাহ্ আল গালিব।
৮। দারসে হাদীস — আব্দুল্লাহ্ সালাফী।
৯। কিতাবুল ফারায়েয।
১০। ঈমানের দুর্বলতা — সলেহ আল উসাইমিন।
১১। শিয়াদের আক্বিদা — আবু ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ্।
১২। চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব — আব্দুস শহিদ নাসিম।
১৩। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব — ভাষান্তর : আসাদুল্লাহ্ আল গালিব।
১৪। চল্লিশ উপদেশ — আত্ তাওহীদ প্রকাশনী।
১৫। নাফসের গোলামী ও মুক্তির পথ — আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বিলাল।
১৬। উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস — মাসঊদ আলাম নাদভী।
১৭। সীরাতুন্ নাবী — আসাদুল্লাহ্ আল গালিব।

রমাযানের সিলেবাস — ২০১৭ (জমঈয়তের কর্মীবৃন্দের জন্য)

১। কুরআন তিলাওয়াত সম্পূর্ণ।
২। সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ১৮৩-১৮৭ আয়াত তাফসীর সহ — আহসানুল বায়ান : আব্দুল হামীদ মাদানী।
৩। সূরাহ্ আল্ ক্বদর।
৪। সহীহ্ বুখারী থেকে সিয়ামের অধ্যায়।
৫। সাহিত্য পাঠ — রমাযানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উপায় — আল্ উসাইমিন।
অথবা
৬। মুমিনদের জন্য মাহে রমাযানের হাদিয়া — সলেহ আল ফাওযান।

মাসিক "সরল পথ" ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা • রমাযান - ১৪৩৮ • জুন - ২০১৭
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18

আস্সালামু আলাইকুম

সত্যান্বেষী ভাই সকল

আপনারা অবগত আছেন যে, মুর্শিদাবাদে অবস্থিত 'সরলপথ ট্রাস্ট' হক ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী একটি ট্রাস্ট। এর মাধ্যমে অনৈসলামিক, অসামাজিক ও অমানবিক যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রচেষ্টা অব্যাহত। সরল পথ পত্রিকা হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিভিন্নভাবে উক্ত পত্রিকায় বর্তমানের জ্বলন্ত সমস্যা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে লেখা বের হচ্ছে। যেমন বের হচ্ছে ইসলামের নামে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট যাবতীয় অপসংস্কৃতির প্রতিবাদ। সরলপথ অ্যাকাডেমী আধুনিক অথচ মূল্যবোধের পাঠ দিতে সদা সচেষ্ট। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী সুযোগ্য শিক্ষক মণ্ডলির মাধ্যমে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে প্রকৃত ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর পরিশ্রম উক্ত ট্রাস্টের কর্মকর্তাগণ করে চলেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষা বিষয়ক প্রশাসনিক কর্ম কর্তাগণ একাধিকবার পরিদর্শনের সময় শিক্ষা ও পরিবেশের মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আপনিও এই মহান কর্মযজ্ঞে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন ও সহযোগিতা দ্বারা এই মহান কর্মযজ্ঞের অংশীদার হতে পারেন। আপনি নীচের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অথবা সরাসরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

তাজাম্মুল হক সালাফী
চেয়ারম্যান সরলপথ ট্রাস্ট
ও সম্পাদক সরলপথ পত্রিকা

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠালে ০৯১৫৩০৪৪১৪১ নাম্বারে অবশ্যই অবহিত করুন।

SARAL PATH ACADEMY
STATE BANK OF INDIA, UMARPUR BRANCH, Umarpur, Murshidabad
A/C No. : 35180888486 • IFSC Code - SBIN - 0012355

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা 'সরল পথ' পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহক, এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটরদের অবগতির জন্য এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, অপরাপর দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ খরচ বৃদ্ধির জন্য আগামী জুন ২০১৭ সংখ্যা থেকে 'সরল পথ' পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৫ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। আশা করি, পত্রিকার সাথে আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত সকলেই মূল্য বৃদ্ধির এই অনিবার্য বিষয়টি মহানুভবতার নিরিখে বিবেচনা করবেন ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা অক্ষুন্ন রাখবেন।

বিনীত
সম্পাদক (সরল পথ পত্রিকা)

মূল্য - ১৮/- টাকা মাত্র
Printed by : K P Press , Habibur Rahman - 9830557609